
জহর মুখোপাধ্যায়

হীরের হরিণ

জহর মুখোপাধ্যায়

নব চলন্তিকা
সাত নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা—নয়

Hirer Harin—a Juvenile novel by Jahar Mukhopadhyay

প্রকাশনে—শ্রীমতী রমা বসু (দাস)
৭১, বিন্দুবাসিনী রোড
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

১ম সংস্করণ ১৩৯৩

প্রচ্ছদে—সুবোধ দাসগুপ্ত

পরিবেশনে

চলন্তিকা
৭ নবীন কুণ্ডু লেন
কলি-৯

বামা পুস্তকালয়
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলি-১২

মুদ্রণে শ্রীজয়দেব আড়ু জয়তারা প্রেস ৩৫সি গোরাচাঁদ বোস রোড—কলিকাতা-ছয়। মুল্য-দশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

সোনার হরিণ থাকতেও এই উপন্যাসের নাম হীরের হরিণ হলো কেন? কলকাতার তুই অসমসাহসিক কিশোর চাকরীর আশায় পূর্ব্ব আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছিল কিন্তু তাদের তাজা প্রাণে ছিল অভিযানের তৃষ্ণা। জনৈক আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদের সংস্পর্শে এসে সেই তৃষ্ণা আরও প্রবল হয়ে উঠলো। একদিন ওরা পা বাড়াল দক্ষিণ রোডেশিয়ার তুর্গম বিপদ সঙ্কুল পথে—হীরের সন্ধানে। আফ্রিকার হীরে বহু পর্যটক আর আবিষ্কারককে স্বপ্ন দেখিয়েছে, হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, আমাদের তুই কিশোর গোগো আর যীশু সেই ডাকে সাড়া দিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু হীরের হরিণ তাদের ধরা দেয়নি, ছুঁই ছুঁই করেও ছোঁওয়া যায়নি! প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছিল এই বুঝি পেয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়ংকর তুর্গম প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে বীরত্বপূর্ণ অভিযানের এক বস্তুনিষ্ঠ ছবি আঁকার চেষ্টা হয়েছে।

জীবন্ত, উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য এক একটি টুকরো আফ্রিকার জীবজন্তু, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনযাত্রা সমগ্র আফ্রিকাকেই খুলে ধরতে সাহায্য করেছে। এর রোমাঞ্চকর সত্যনিষ্ঠ চরিত্র সমূহ কিশোর পাঠকের মনে সাড়া জাগালে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই বইয়ের প্রকাশিকা শ্রীমতী রমা বসুর (দাস) দান লেখকের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে। নব চলন্তিকার হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখককে অশেষ সহযোগিতা করেছেন।

কলিকাতা | বিনীত
মহালয়া, ১৩৯৩ | জহর মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

প্রয়াত অধ্যাপিকা অমিতা মিত্রের অক্ষয় স্মৃতির উদ্দেশ্য

—শ্রীবিমলচন্দ্র দাস

এক

গোগো একেবারে খাস কলকাতার ছেলে। এ বছর স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। কাজের মধ্যে সকালে একপাল ছেলে নিয়ে আড্ডা জমানো। দুপুরে কারো বাড়ীর রকে বসে খেলোয়াড়দের কুষ্টি-ঠিকুজী নিয়ে গবেষণা করা, বিকেলে ময়দানে খেলা দেখতে যাওয়া।

সারা বর্ষাকালটা এভাবে কাটার পরে একদিন তার মাসী ডেকে বললেন—শোন একটা কথা বলি গোগো, তোর মেসোর শরীর ভালো নয়, ব্যবসা-পত্তর পড়ে গেছে এ অবস্থায় তোর পড়াশুনার খরচ চালাবে কে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা করে ছাখো, স্কুলের পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেল।

মাসীর কথাটা গোগোকে ভাবিয়ে তুলল। সত্যিই তার মেসোমশায়ের ব্যবসা পত্তর খুব খারাপ হয়ে গেছে। নিজের সংসার চালানো তার কাছে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তার উপর একটা বাড়তি লোক, গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো। অথচ করবেই বা কী? এখন কি তাকে চাকরি দেবে কেউ? যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক লেখাপড়া শিখে চাক্‌রির জন্য হাঁ-পিত্যেশ করে বসে আছে সেখানে সে-ও তো খুব তুচ্ছ।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বয়েস তিন দশকেরও বেশী। ১৯৮২ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার খুবই মন্দা। গোগোর মেসো এক ভদ্রলোককে অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন যাতে তিনি গোগোকে কলে কারখানায় একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। কিন্তু চাকরি কোথায়, কে দেবে? ভদ্রলোক পরদিনই এলেন গোগোর জন্য তিনি পেট্রল ফিলিং স্টেশনে কাজ একটা ঠিক করে এসেছেন।

গোগো খুব একটা সাধারণ ছেলে নয়। স্কুলের বাৎসরিক খেলাধূলায় দুবার সেরা স্প্রিণ্টার হয়েছিল। সাঁতারে তার জুড়ি ছিল না! ফুটবলে ওর মতো স্ট্রাইকার ওদের পাড়ায় তখন কেউ ছিল না! এইসব কারণে পরীক্ষার খাতায় ভাল একটা নম্বর উঠত না। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ঘাবড়ে গিয়েছিল খুব।

কিন্তু ওর একটা বিষয়ে অদ্ভুত কৌতূহল ছিল। ভূগোল আর বিজ্ঞানের বই পড়া। জ্যোতিষ্কদের অবস্থান, গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা তার বাতিক ছিল। জ্যোতিষ্ক বলতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা ঐ জাতীয় যারা আলো বিকিরণ করে। কিন্তু ওদের প্রতিবেশী হিসেবে এমন বেশ কিছু বস্তুরও সন্ধান পাওয়া গেছে যারা মোটেই আলো দেয় না। তাদের নাম রেডিও তরঙ্গ, এক্‌স রশ্মি এমন অনেক জ্যোতিষ্ক আছে যারা আলো পাঠায় না কিন্তু রেডিও তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। শব্দের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে তার সাহায্যে গ্রাফ কাগজে ঐ শব্দের রেখাচিত্র এঁকে তার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় —এ সব ও ভালভাবেই জানে। আমাদের দেশের খুব কম ছেলেই আছে যারা এ সব তথ্যের খুঁটি-নাটি সংগ্রহ করে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে লাইব্রেরী থেকে দু খানি বই এনেছে। স্যার এইচ, এইচ, জনস্টন, আর রোসিটা ফরব্‌স এর ভৌগোলিক অনুবাদ গ্রন্থ। রাত্রি বেলা টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোর সামনে ওই বই দুখানি খুলে নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে। পড়ে আর কি ভাবে! মেসোমশাই একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে দুর্গা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাং ঝালের কাজ করে সারাদিন। মাসির অসুখ, সংসারে অভাব, হয়তো সে জন্য মেসোমশায়ের মুখে কল কারখানায় একটা কাজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। শেষ পর্যন্ত ভবানীপুর পেট্রল ফিলিং স্টেশনে একটা কাজের খবর পেল।

ফুটবলের নাম করা স্ট্রাইকার, স্কুলের সেরা দৌড়বার, যাবে

পেট্রল ফিলিং স্টেশনে কাজ করতে ? তার তরুণ তাজা মন এ কথা ভাবতেই পারেনা। ভাবতে গেলেই সারা দেহ মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে —বুলডগ শেষ কালে ডাষ্টবিনে খাবার খুঁজতে যাবে ?

ছেঁড়া মাছুরের উপর শুয়ে অজস্র ভাবনা প্রদীপের শিখার মতো দপ্ দপ্ করছিল অশান্ত মনে। তার মন-পাখী ডানা মেলতে চায় অনেক দূরে, দূর দেশে —হাজার হাজার দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। স্যার ডেভিড লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুশোর মতো দুঃসাহসিক কাজের হাতছানি তার মন কেড়ে নিতে চায়। সে জন্য ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরী করেছে। সংগী জুটেছে একজন। ওদেরই ক্লাসের ছাত্র যীশু। বাঙালীর ছেলে পাহাড় ডিঙিয়ে তিব্বতে গেছে সে কাহিনী স্কুলের পাঠ্য বইয়ে গোগো পড়ছে। দুর্গম পার্বত্য পথে, গভীর জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে অজ্ঞাত অঞ্চলে পাড়ি দেওয়া তার কাছে মোটেই দুরাশা নয়। বরং এটা ভাবলেও মন আনন্দে নেচে ওঠে। এই দেয়াল ঘেরা ছাদে ঢাকা জীবনের জেল খানায় থেকে গোগোর হাঁফ ধরে গেছে। লাইন পাতা, ছক বাঁধা রাস্তায় হেঁটে ছুটে ঝুলে অরুচি ধরে গেছে।

জার্মান ভূ-পর্যটক অ্যান্টন হাউপ্টম্যানের লেখা আফ্রিকার একটা বড়ো পর্বত ডিঙোনোর আশ্চর্য এক বিবরণ যীশু পড়ে গোগোকে শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে গোগোর মনে হয়েছে হের হাউপ্ট ম্যানের মতো সেও একদিন চিমানামানি ডিঙিয়ে দুর্জয় ক্রুগার মাউন্টেনের মাথায় মানুষের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে আসবে।

স্বপ্ন। এতো শুধু কল্পনা। আলাদিনের আশ্চর্য পিদিমের মতো চিমনামানি ডিঙোনো বুঝি সহজ কথা ?

কিন্তু মানুষের জীবনে হঠাৎ এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না। সব মানুষের জীবনে এমন এক আধটা ঘটনা রাতারাতি ঘটে যায়, তখন

বদলে যায় সব। সব কিছুই। গোগোর জীবনেও এমন হঠাৎ ঘটে গেল!

সকাল বেলা রেড রোড ধরে রবীন্দ্র সদন ছুঁয়ে মাইল দুয়েক জগিং করে এসে সবে মাত্র বাড়িতে পা দিয়েছে এমন সময় পাড়ার একটা মেয়ে এসে বললো, গোগোদা, আমার দাদার খোঁজ পাওয়া গেছে অনেক দিন পরে! আমাদের বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে, এই দেখুন তার ঠিকানা। পড়ে দেখুন তো—

গোগো মুহূর্তকাল চোখ বন্ধ করে কি ভাবল, তারপর এক সময় চোখের পাতা দুটো বিস্ফারিত করে বললো উফ প্রায় তিন বছর পরে খোঁজ পাওয়া গেল। বাড়ি থেকে পালিয়ে কি ভেল্কিটাই দেখালো! ছোট বেলা থেকেই মন উড়ু উড়ু তাই না? তারপর সে কাগজের ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়ল। লেখা আছে বীরেন্দ্র নাথ দাস, উগাণ্ডা ইলেকট্রিক্যাল কনস্ট্রাক্‌শন ডিপার্টমেণ্ট, মোম্বাসা, পূর্ব আফ্রিকা।

গোগোর হাত থেকে চিঠিখানা পড়ে গেল, পূর্ব আফ্রিকা; বাড়ি থেকে পালিয়ে মানুষ এতদূরে যায়? তবে সে জানে ক্লাশের ফাষ্ট বয় এই বীরুদা খুব একগুঁয়ে, জেদী ও ভবঘুরে ধরণের। একবার খেলার মাঠে গোগোর সঙ্গে তর্কাতর্কিও হয়েছিল। উত্তেজনা সামাল দেবার মতো শুভবুদ্ধি বীরুদার ছিল না। তা সত্ত্বেও ছেলেটা ছিল খুব উদার। লেখাপড়ায় ভালো ছিল। তবে কোন এক জায়গায় চুপচাপ থাকতে পারতো না। মন ছিল উড়ু উড়ু। আর একবার পালিয়ে সেই তিব্বত না কোথায় গিয়েছিল। কী নিয়ে মন কষাকষি হওয়ায় বাড়ী থেকে পালিয়ে ছিল। এ খবর গোগো আগেই শুনেছিল।

মেয়েটি ভাল করে বুঝতে পারল না তার দাদা কত দূরে গিয়েছে। আফ্রিকার কথা ভুগোলে সে পড়েছে। তবু সঠিক ধারণা ছিল না। সে চলে যেতেই গোগো কেমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবল। স্মৃতির পাখির পিঠে চড়ে সেই মুহূর্ত্তে উধাও হয়ে গেল কোথায়। গোগোকে তার মনে আছে কি? বীরুদার পাড়ার ছেলে সে। এবার স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে গোগো হন্যে হয়ে ঘুরছে। বীরুদা কি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবে? দূরে হলেও আপত্তি নেই।

দু-মাস পরে, যখন গোগো বীরুদাকে চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়ে একরকম হতাশ হয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময় একটা চিঠি এলো গোগোর নামে।

৫নং কাসিগাউ,
দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রিয় গোগো,

তোর চিঠি পেয়েছি। তোকে আমার ভাল ভাবে মনে আছে। সাউথ ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে তোর দেওয়া হাফ ডজন গোলের অপমান সহ্য করতে পারিনি সে কথা মনে আছে। তুই আসবি এখানে? চলে আয়! ছকে বাঁধা লাইন পাতা জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে এখানে চলে আয়। তোর মতো ছেলেরা যদি ঘরের বাইরে না আসে তবে কে আর আসবে? প্রকৃতি এখানে অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। চলে আয় উদোম মাঠে আকাশের তলায় নিবিড় অরণ্য আর পাহাড়ের কোলে। আরব বেদুইনের উধাও দিগন্তের সাথে আলাদীনের পিদিম ঘষা জীবনের অফুরন্ত হাতছানি! এখানে নতুন বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার বসেছে। অনেক লোক নেবে। খুব শিগ্‌গিরই আমাদের কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনিয়ার কলকাতায় যাবে ছুটি কাটাতে। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তোর চাক্‌রি জুটিয়ে দেবার ভার আমার উপর।

তোর বীরুদা

চিঠি হাতে পেয়ে আশ্চর্য হবার শক্তিটুকুও যেন চলে গিয়েছে

গোগোর। বিস্ময়ও নয়, কল্পনাও নয়। এ এক অপূর্ব অনুভূতি। শুধু মাত্র চাকরির সন্ধানে নয়, একটা প্রস্ফুটিত অভিযানের স্বপ্ন-সম্ভব একটি পথের টানে।

গোগোর মাসি মেসো দুজনেই চিঠি দেখে খুব খুশী। যৌবনে গোগোর মেসো একবার ভারতীয় প্লেটুনের সুবেদার হয়ে বার্মা মুলুকে গিয়েছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। গোগো চাকরি করতে অনেক দূরে যাবে তাঁর এতে অমত ছিল না। খুব ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা হারা ছেলের মতোই মাসী মেসোর সংসারে আশ্রয় নিয়েছিল। সংসারের আটপ্রহর অভাব অনটনের উপর একটা বাড়তি ছেলের ঝামেলা কাঁধে নিয়ে তারা অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু উপায় কি?

এর সপ্তাতিনেক পরে গোগোর কাছে এক ভদ্রলোক এলেন চুঁচুড়া থেকে। লোকটি বাড়ীতে এসেছেন সম্প্রতি। বীরুদাই গোগোর ঠিকানা দিয়েছে। লোকটি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরবেন দু'সপ্তাহ পরেই। গোগোকে তা হলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।

লোকটি চলে যেতেই মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে গোগো কি ভাবল। মাটি থেকে চোখ তুলে রাস্তার দিকে তাকাল কি তাকাল না, আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। স্যাঁত সেঁতে উঠোনের নর্দমা থেকে বিশ্রী একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আর দুর্গন্ধ আসছে। কোন ঘরে কারা উনুনে আঁচ দিয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কঠিন মিশ্রিত ভারী বিষাক্ত ধোঁয়া বস্তির অসহায় মানুষের শ্বাসরোধ করার জন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে।

চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল গোগো। মাসী এগিয়ে এলেন। ওর পিঠে হাত রাখতেই বিদ্যুৎ পৃষ্ঠের মতো চমকে উঠলো, পর মুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে মাসীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে—উঠে

দাঁড়াল। কথা বেশী হলো না। বেশী বলা গেল না। সন্ধ্যেয় জানানো গেল বিদায় আসন্ন। এ বাড়ীর দুঃখ ও বিড়ম্বিত জীবন থেকে শেষ প্রহর আসন্ন।

সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে একটা সাড়া জেগেছে। অসংখ্য রক্ত কণিকায় দুর্জয় দুর্বার অভিযানের তৃষ্ণা, ভয় ভালবাসা, অভিমান সব বন্যার প্লাবনের মতো মনের আনাচে কানাচে, অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরে গেছে।

বিকেলের দিকে একটা ট্যাক্সি এসে থামল গোগোর বাড়ীর সামনে। প্যান্ট কোট পরা এক ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নেমে হন্‌হন করে ঢুকে গেল গোগোদের বাড়ীর দিকে। পূর্ব আফ্রিকা পাড়ি দেবার একটা পাসপোর্ট এবং ভিসা তাড়াতাড়ি যোগাড় করার মতো আটঘাট তার জানা ছিল। তাই অসুবিধে মোটেই হয়নি। আর কিছুক্ষণ পরেই ওরা উড়বে। কলকাতা থেকে বোম্বে হয়ে কায়রো'র আকাশ ছুঁয়ে নাইরোবীগামী বিমান ধরবে সন্ধ্যের আগেই। যীশু তৈরী হয়ে এসেছে। জলের ফ্লাস্ক, কীট্‌স ব্যাগ একটা ছোট বেডিং প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ। যীশু আর গোগো দুই বন্ধু। হরিহর আত্মা দুজনেই। ওরা চলে যেতেই রাস্তার ধারের একটা জানলার কপাট সন্তর্পণে বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার প্রেক্ষাগারে সেই নিভৃত দৃশ্যের একমাত্র দর্শকের মুখে একটু হাসি খেলে গেল।

দুই

দু মাস পরের ঘটনা। গরমকালের শেষ।

উত্তর উপকূল ও টেল আটলাসের মধ্যবর্ত্তী টেল অঞ্চল দিয়ে যে রেলপথ গেছে তাকে অনেক পেছনে ফেলে একেবাবে দক্ষিণ পূর্ব উচ্চ মালভূমি অঞ্চলের টাঙ্গানিকা হ্রদের ধারে একটা বৈদ্যুতিক লাইন বসছিল। জায়গাটা উগাণ্ডা রেলওয়ের ন্নুডসবার্গ স্টেশন থেকে সাড়ে চারশো মাইল ভেতরে। এখানে গোগো ইলেকট্রিক্যাল কনষ্ট্রাকস্‌ন কোম্পানীর সার্ভেয়রের কাজে এসেছে। বীরুদাই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে। দুই বন্ধুতে ছোট একটা তাঁবুতেই থাকে। অনেকটা এলাকা জুড়ে কাঁটা তারের বেড়া পড়েছে। তার মধ্যেই বৈদ্যুতিক লাইন তৈরীর কাজ চলেছে। সার্ভেয়ারেরা ফিতে ফেলে মেপে দেখছেন। ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রেখে ইঞ্জিনিয়ারেরা সুপার-ভাইজারদের নির্দেশ দিচ্ছেন। শাবল আর গাঁইতির ঘায়ে মাটি ভেঙে চৌচির, গাছের ডালে কুড়ল পড়ছে। বৈদ্যুতিক লাইন বসবে। নতুন সৃষ্টির কাজ চলেছে। ছোট ছোট জীপ গুলো ঘন ঘন যাতায়াত করছে। এখানে এখনও বাড়ীঘর তৈরী হয় নি বলে তাঁবুতেই সকলে থাকে। তাঁবুগুলো প্রকাণ্ড একটা খোলা জায়গায় গোলাকার ভাবে সাজানো। একটু দূরেই লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা ঘন ঝোপ। ঝোপের মধ্যেই প্রকাণ্ড দু তিনটে গাছ। একটা গাছের গুঁড়ির বেড় প্রায় চল্লিশ হাত। মাটি থেকে হাত নয় দশ গুঁড়িটা সোজা উঠে গেছে। মোটা ডালপালা গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। গাছগুলোকে দূর থেকে মনে হয় এক একটা দৈত্যের মতো। আফ্রিকার সেই বিখ্যাত মোয়ানা গাছ, গোগো ভূগোলে পড়েছে।

কনষ্ট্রাকশন তাঁবুর হেড মিস্ত্রী একদিন গোগোকে ডেকে বললেন —মাই ডিয়ার গোগো তাঁবুর বাইরে একা একা বেরুবে না কখনও। তোমরা কলকাতার ছেলে। আফ্রিকা দেশটা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই তোমাদের। বিনা বন্দুকে এক পা-ও যাবেনা। ওই যে দেখছো কাঁটাগাছের ঝোপ ওরই মধ্যে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে কত লোক এ সব জায়গায় মারা গেছে গলা শুকিয়ে। উগাণ্ডার সিংহ খুব হিংস্র তা ছাড়া আরও একটা জন্তু সিংহের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী উগাণ্ডার ওই গভীর জঙ্গলে আছে। সারা গা কালো লোমে ঢাকা, পালোয়ানের চেয়েও চওড়া বুক, লম্বা লোমে ঢাকা পেশীওয়ালা দু খানা হাত, বীভৎস মুখ-দাঁতগুলো খুব লম্বা ও ধারালো। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল দুষ্টুমি আর হিংস্রতায় ভরা। গরিলার নাম শুনেছো নিশ্চয়ই-খুব সাবধান। এ সব অঞ্চল একটুও নিরাপদ নয়।

গোগোর সারা মন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল। বহুদূর বিদেশের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সে সামনের অফুরন্ত নির্জন অরণ্য প্রকৃতির আলোছায়া মাখা রূপের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কি ভাবছিল ওই যে বাওবাব গাছের সারি দেখা যাচ্ছে তারপর থেকে কি বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর। মধ্যে পড়বে কত পর্বত বন-জঙ্গল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কতো নগর, কতো নদীর অববাহিকার বিরাট অংশ জুড়ে কালো মানুষ কাফ্রি, নিগ্রো আর বান্টুদের বসবাস। এই অংশের গভীর জঙ্গলে এখনও মানুষের সাড়া পাওয়া যায় নি। এখনও অনাবিষ্কৃত ও দুর্গম। শোনা যায় এই সব জঙ্গলেই পিগ্‌মিরা বাস করে। উত্তর পশ্চিমের নিম্নমালভূমির মধ্যে পড়বে লিবিয়া, নুবিয়া টিমবাক্‌টো মরুভূমি দক্ষিণে কেপটাউন পর্যন্ত বিশাল বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরের খনি, সোনার খনি।

একজন শিকারী জঙ্গলের আঁকা বাঁকা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে

হোঁচট খেয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেয়ে পড়লেন সেটা হাতে তুলে পরখ করে দেখলেন। চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। একি! এ যে সোনার চাঁই সে জায়গায় বড় একটা সোনার খনি বেরিয়ে গেল। এ রকম কত গল্প তাঁবুতে বসে বান্টু সর্দারের মুখে শুনেছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে বান্টু আর মাসাই শ্রেণীর লোকেরা বর্ত্তমানে কল কারখানায় ও চাষ বাসের কাজ করে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ, কালো মানুষের দেশ, চিড়িয়াখানার দেশ, বাঘ ছাড়া কতো হিংস্র বীভৎস বিচিত্র জীবজন্তু এর জঙ্গলে জঙ্গলে অরণ্যে পর্বতে আড্ডাখানা বানিয়ে রেখেছে। কতো অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অজানা জাতি আর হিংস্র প্রাণী এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্য পর্বতে লুকিয়ে আছে তা কে জানে?

এলোমেলো ভাবতে ভাবতে গোগোকে এক সময় উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঘুমের দেশে। সেখানে কতো সব আশ্চর্য দৃশ্যাবলী। ঠোঁটে আলগা একটা হাসির রেখা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মানুষ হাসে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে গোগোর ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তখন রাত তিন প্রহর। বনস্পতির মাথায় আধখানা চাঁদ লটকে আছে। অনেকটা ময়লা ঘুড়ির মতো। কুলিরা সব আগুনের চারধারে শুয়ে আছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের লয়ে শরীর দুলছে ওদের সাড়াশব্দ নেই কোন।

গোগোর দৃষ্টি হঠাৎ থমকে গেল—তার পাশে তো একটা মাসাই কুলি হাত পা গুটিয়ে শুয়েছিল। সে গেল কোথায়? তা হলে সে কি তাঁবুর মধ্যে গিয়েছে?

গোগো নিজে উঠে ফ্লাক্স থেকে জল খেতে যাচ্ছে এমন সময়ে হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে কিছুদূরে সিংহের গর্জন শুনতে পেল। নিঃস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে কেঁপে উঠল্ সেই শব্দ। কুলিরা সব একই শয্যায়

শুয়েছিল মাসাই কুলি, বান্টু কুলি, নিগ্রোকুলি সবাই ধড়মড় করে এক সঙ্গে জেগে উঠল। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় ওরা সকলেই এক। সকলেরই হাতে হাতিয়ার। শাবল গাঁইতি, বর্শা হাতের সামনে, যে যা পেল ছুটল তাই নিয়ে। মশাল হাতে ক'জন দৌড়ে গেল। কনস্ট্রাকসন সাইটের হেড ইঞ্জিনিয়ার বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। কুলিদের সকলের হৈ হল্লা আর মশালের আলোয় বনভূমি পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। সেই প্রথম সিংহের গর্জন—সেই রাত্রির নিস্তব্ধতা চৌচির করে সদ্য ঘুম ভাঙা মানুষ গুলোর অকস্মাৎ ছোটাছুটির মধ্যে এক রহস্যময় দুঃসাহসিক ঘটনার মুখোমুখি হলো। একজন বুড়ো মাসাই কুলি ছিল তাঁবুতে সে বলল, সিংহটা দল ছুট হয়ে গেছে। বর্ষাকালে ওরা প্রায়ই আড্ডা ছেড়ে অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়। ঘুরতে ঘুরতে কখনো বা এমন অঞ্চলে গিয়ে পড়ে যেখানে শিকার পাওয়া যায় না, বাধ্য হয়ে তখন লোকালয়ের কাছে এসে পড়ে। গরু ছাগল না মারলে এমন গর্জন করে না।

একটু থেমে আবার বললো এই উগাণ্ডার জঙ্গলেই মার্কিন শিকারী অ্যালেন ব্লেক মেরেছিলেন চোদ্দটা সিংহ, তাদের ল্যাজ গুলো দিয়ে তিনি টুপি সাজিয়েছিলেন। তাকে টেক্কা দিয়েছিলেন আর এক মার্কিন শিকারী লেসলি সিম্পসন যিনি এক বছরে পঁয়ত্রিশটা সিংহ মেরেছিলেন। মার্কিন শিকারীরা শিকারকে জীবিকা হিসেবে আফ্রিকায় এসে সিংহ শিকার শুরু করে। একটা সিংহের চামড়ার দাম মোম্বাসার বাজারেই এক পাউণ্ড।

আফ্রিকার সাভো অঞ্চলেই সিংহের আড্ডা সবচেয়ে বেশী। নাইরোবী থেকে শ' দুই মাইল ভেতরে এই জায়গা। এই অঞ্চলে সিংহের আতঙ্কে ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে অনেক লোক। রেল লাইনের কাজ করতে করতে অসংখ্য কুলি সিংহের পেটে গেছে। ফলে কয়েক বছর আগে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে সিংহ নিধন যজ্ঞের জন্য বহু বিখ্যাত শিকারী প্রাইড শিকারে আসত।

সিংহের দলকে ইংরেজীতে 'প্রাইড' বলে। বর্তমানে আফ্রিকায় এই কথাটিই বেশি প্রচলিত। সাভো থেকে মাইল সাতেক দূরে ক্যুল পাহাড়। এখানে শুধু বন্য আগাছার বিস্তার, কোন রাস্তা বা রেলপথ নেই। এমনকি সিংহের উপদ্রবে রেল লাইন তৈরীর কাজ বন্ধ রাখার আদেশ দিতে হয়েছিল। সাধারণত উঁচু ঘাস আর দিগন্ত বিস্তৃত বন্য আগাছার অন্তরালে সিংহের লুকিয়ে থাকার পক্ষে চমৎকার জায়গা। গোগো আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে আফ্রিকার ঐ সব গভীর জঙ্গলে কান পাতলে শোনা যায় কতো হতভাগ্য কুলির অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস। গোগোই বা কি জন্য এখানে এসেছে তার অদৃষ্ট, কে বলবে সে খবর।

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর প্রকৃতি—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ংকর। মোয়ানা আর বাওবাব গাছের মধ্যে মধ্যে আচ্ছাদিত লতা। কাঁটা ঝোপের অফুরন্ত বিস্তৃতি। গ্রামবাংলার কাশ গাছের মতো দেখালে কি হবে, আফ্রিকা দুর্গম বন্ধুর আর অজানা মৃত্যু সঙ্কুল। যেখানে সেখানে আচমকা মৃত্যুর নিপুণ ফাঁদ পাতা। এখানে অদৃষ্ট দেবতা তার জন্য কি নিয়ে অপেক্ষা করছে তা বলতে পারে কে?

সেও তো এই রকম জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তার রক্তের শিরায় জেগেছে অভিযানের তৃষা। এই জনহীন প্রান্তর, আলেয়ার আলো দুর্গম পর্বতের হাতছানি যেখানে প্রতি মুহূর্তে বিপদের গন্ধ—সেই ভয়ংকর সুন্দরের ডাকে সাড়া দিয়ে রোমাঞ্চময় জীবনই তো সে চেয়েছিল। রোগে অভাবে দারিদ্রে বিরহে ধুঁকে ধুঁকে মৃতদেহ বয়ে বেড়ান কেরাণীর পক্ষে সম্ভব হতে পারে, তার নয়।

মে মাসের প্রথম থেকে বৃষ্টি নামল। উগাণ্ডা ও সুদানের সীমারেখায় শিমুল থেকে সোবাতের সঙ্গম স্থল পর্যন্ত গজল সমভূমিতে গরমকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। সিংহের উপদ্রব আর

একটানা বর্ষার প্রকোপে জায়গাটা কিছুটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

গোগো আর যীশুকে কনস্ট্রাকশন সাইটের তাঁবুতে থাকতে হলো না, আটবারা থেকে খার্টুম পর্যন্ত যে রেলপথ গেছে সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার কাসিগাউ অঞ্চলের কাছাকাছি এক জায়াগায় সাইট সুপারভাইজারের কাজ পেয়ে দুজনেই চলে গেল।

তিন

নতুন চাক্‌রি পেয়ে গোগো আর যীশু খুশী মনে যখন ট্রেন থেকে নেমে তাঁবুতে এলো তখন বেলা পাঁচটা হবে। ওদের তাঁবুর আশে পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়ীঘর তৈরী হয়নি বলে কনস্ট্রাক্‌শন সাইটের লোকজনেরা তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় ছড়ানো ছিটানো রয়েছে, সার্কাসের এরিনার মতো অনেকটা তাঁবু থেকে একটু দূরেই ধূ ধূ প্রান্তর। মানুষের সাড়া শব্দ নেই কোথাও। যতদূর চোখ যায় শুধু লম্বা লম্বা ঘাস। মাঝে মাঝে মানুষের মাথা সমান কাঁটা গাছের ঝোপ। একে বারে শেষ সীমায় দু-চারটে ইউকা গাছ। সেই তরঙ্গায়িত সীমাহীন বন্য বিস্তৃতিতে যে কোনদিন লাঙল প্রবেশ করে নি তা দেখলে বোঝা যায়।

এই তাঁবুতে সে আর যীশু একসঙ্গে থাকে। একটা ভারতীয় কুলি পর্যন্ত নেই। একজন বান্টু কুলি ওদের নিষেধ করে গেল— রাতের বেলা তাঁবুর ভেতরে আগুণ জ্বালিয়ে যেন ঘুমোয়।

গোগো বলেছিল কেন ?

সে প্রশ্নের উৎসাহজনক উত্তর বান্টু কুলি সর্দারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার উত্তর অন্যদিক থেকে সে রাতেই পেল। গোগো তখন ঘুমিয়ে আছে। পাশের বিছানায় যীশু। ঘর অন্ধকার, হঠাৎ গোগোর ঘুম ভেঙে গেল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা অনুভূতি যেন ভীষণ একটা বিপদের বার্তা দিয়ে গেল। তাঁবুর অন্যসব কুলিরা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে শুয়ে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে রয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, গোগোর সমস্ত শরীরটা যেন কেবল

শিউরে উঠলো। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া গেলনা কোন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হলো! সঙ্গে সঙ্গে ওর স্নায়ুগুলো একলাফে সতেজ ও টান টান হয়ে উঠল। হঠাৎ টর্চটা হাতড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল আর মুহূর্ত্তের মধ্যে একলাফে আলোটা ছিটকে গিয়ে অন্ধকারের বুকে অনেকটা জায়গা দখল নিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে পিছু ফিরে দাঁড়াল।

ক্যাম্বিশের খাটের নীচেই এক জায়গায় আলো আঁধারির মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে আফ্রিকার ভীষণ হিংস্র ভয়ঙ্কর সাপ—কালো মাম্বা। লম্বায় বারো ফুটের ও বেশী। আঙুলের চেয়ে মোটা নয়। এই সাপেরা ফুৎকারের সঙ্গে প্রাণীর চোখ লক্ষ্য করে বিষ নিক্ষেপ করে, এর ফলে প্রায়ই মানুষ অন্ধ হয়ে যায় ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষ নিক্ষেপ করার সময় এই সাপেরা ফণাটা পেছন দিকে নিয়ে তারপর হঠাৎ বিষ দাঁতের পেশীগুলো সংকুচিত করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটো সরু লাইন ধরে হলদে বিষ ছিটকে বেরিয়ে আসে। অব্যর্থ ওদের লক্ষ্য। 'মা' বলতে সময়টুকু দেয় না। প্রায় দশ ফুট পর্যন্ত বিষ ছিটকে আসে।

গোগো টর্চের আলোয় দেখতে পেল সাপের চোখ ছুটো জ্বলছে যেন ছুটো বেদনার দানার মতো। কি ভয়ঙ্কর তেজ ও শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মতো কালো মিশমিশে সরু দেহটাতে। প্রচণ্ড রাগ আর হিংস্রতার উদ্যত ছোবল মাটির বুকে আছড়ে পড়ছে।

গোগো স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কেমন গোলমাল হয়ে গেল। ভুলে গেল সব। সে কোথায় এসেছে, কোথায় যাবে। সাইটের কাজকর্ম এমন কি ওর সঙ্গী যীশুকে পর্যন্ত ভুলে গেল। এই মুহূর্তে তার সামনে মৃত্যু দূত স্বশরীরে হাজির হয়েছে যার চোখ ছুটো আলোর দানার মতো জ্বল জ্বল করছে। এক বারই ছোবলে পনেরোশো মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে

দিয়ে নিমেষের মধ্যে যমরাজ্যের রান্না ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারে। কোন দিকে চেয়ে দেখার অবসর নেই। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তার চিন্তা ও চেতনাকে অবশ করে দিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বন্দুকের গর্জন হলো ব্ল্যাক নাম্বার উদ্যত ফণা উড়ে গেল। গোগো চমকে উঠল। অনেকটা বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চিৎকার করে উঠল কিন্তু তার আগেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মাথার টুপি খুলে হাসতে হাসতে হাসতে বললো—মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড, য়ু আর কোয়াইট পাজল্‌ড। বুঝলেতো জঙ্গলের দেশ এটা। গঙ্গারামের মতো হাঁ করে থাকলে চলবেনা ব্ল্যাক মাম্বার হাতে থেকে তুমি বেঁচে গিয়েছো সেটাই বড়ো কথা আমার মনে হয় সাপটাই করুণা করেছে তোমাকে। আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা যেখানে থাকে তার ত্রিসীমানায় লোক থাকে না। বলতে বলতে একটা বোতল কোটের পকেট থেকে বের করে বললেন, এই নাও, তাঁবুর চারপাশে ছড়িয়ে দিও। কার্বলিক এ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে সাপের উপদ্রব কিছুটা কমবে আর শোন—ঘুরে দাঁড়াল গোগো। এটা বলতো কি? জিনিসটা ওর চোখের সামনে তুলে ধরল। পিস্তল। গোগো অস্ফুট স্বরে কি বললো! ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এটা রক্ষা করচ তোমার। গোগো মাথা নীচু করে কৃতজ্ঞতা জানালো। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আরও। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো তার একটা সহজাত স্বভাব। সেজন্য গোগোর কথায় তিনি আমল দিলেন না। তাঁবুতে ফেরার সময় শুধু বলে গেলেন প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করবে। আফ্রিকা দেশটা জঙ্গলের রাজ্য। বহু তরুণ তাজা যুবকের বলি গ্রহণ করেছে ঐ ক্ষুধার্ত আফ্রিকা! কতো দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বেঘোরে পড়ে এখানে প্রাণ হারিয়েছেন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চলে যেতেই গোগো ফ্লাস্ক খুলে জল খেতে গেল। গলাটা শুকিয়ে খর খরে হয়ে গেছে। একটু জল না হলে

চলছেই না। কিন্তু জল কোথায় পাবে। মরুভূমির রাজ্যে জলের অভাব সে কথা সকলেই জানে। ফ্লাস্কে যেটুকু জল ছিল সেটা কখন খেয়ে নিয়েছে, খেয়াল নেই। ফ্লাস্কটা উঁচু করে দিল মুখের উপর কিন্তু গলা ভিজল না, একটু ভিজে ভিজে স্বাদ পেয়ে তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠলো আরও। আশে পাশে জলাশয় শুকিয়ে গেছে। শুনলো তাঁবু থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা জলাশয় আছে। জায়গাটা ভাল নয় সে কথা মাসাই কুলি সর্দারের মুখেও শুনেছে, সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে। অনেক সময় নাকি সেখানে সিংহ জল খেতে আসে।

তৃষ্ণার জল, স্নান ও মাছ ধরার টানে এক সময় দুই বন্ধু রওনা হলো সেখানে—সঙ্গে একজন মাসাই কুলি সে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওরা তার পিছু পিছু। জলাশয়টা তাঁবু থেকে অনেক দূরে। মাঝে একটা উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছের ঝোপ, তার মধ্যে দিয়ে সরু একফালি রাস্তা, আঁকা বাঁকা। সহসা কয়েকজন লোক চোখে পড়ল। জঙ্গলের পথ ধরে হেঁটে আসছে। ওরা নেংটি পরা নিগ্রো আর বান্টু—ওদের সকলেই কাঁধে একখানা করে লাঠি, লুঙ্গির মতো করে ছোট শাড়ি ফেরতা দিয়ে পরা মেয়েরা পিঁপড়ের সারির মতো এক সঙ্গে অনেকগুলো লোক বক্‌বক্ করতে করতে ওদেরই পাশ দিয়ে চলে গেল।

গোগো তেরছা চোখে একবার দেখল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়েসী মেয়েটা একবার পিছু ফিরে সোয়াহিল ভাষায় কি সব বলতে বলতে শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই অন্য আর একটি মেয়েকে আচমকা সরিয়ে দিল এক ধাক্কা দিয়ে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় সোয়াহিল সর্বত্র চালু ভাষা।

ছোট একটা পাহাড় পেছনে রেখে ওরা একটা বাওবাব গাছের কাছাকাছি এলো। শান্ত সকালের হাওয়া আলগাভাবে খেলা করে গেল ওদের চোখে মুখে চুলে, কাঁচা হলুদের মতন আলো চারিদিকে।

বাওবাব গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওরা চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ডান দিকে যত দূর দেখা যায় বড় বড় গাছের সারি, অনেক দূরে আব্ছা একটা পাহাড়, বাঁ দিকে জঙ্গল শুরু হয়েছে। জঙ্গল চিরে চলে গেছে রেল লাইন। খার্টুম থেকে আটবারা পর্যন্ত যে লাইন ছিল তা সম্প্রসারিত হয়েছে আরও। ওইতো চলন্ত একটা ট্রেন বহুদূর থেকে অস্পষ্ট একটা রেখার মতো দেখাচ্ছে।

জলাশয়ে নামার আগে ওরা যেন বাওবাব গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখছে। সামনেই বাড়ি ঘর বলতে নেই কিছু। কিছুটা ফাঁকা জায়গা একটু দূরে দেখা যাচ্ছে। তারপর দু তিনটে ছোট পাহাড়, এক পাশে জঙ্গল।

দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার ঝোপের একটা বৈশিষ্ট্যে আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়তো নেই। এ ঝোপ না জঙ্গল, না ফাঁকা জায়গা। বড় বড় গাছ খুব অল্পই, বেশির ভাগই ছোট ছোট কাঁটা গাছ, বড়জোর দশ পনেরো ফুট। এই সব কাঁটা গাছ বা কাঁটা ঝোপ বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। সেখানকার মাটি বালি মেশানো, আর লালচে। এ মাটিতে সহজেই পায়ের ছাপ পড়ে। তাই কোন চিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। কোন কোন জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস জন্মায়, সেখানে ফাঁকে ফাঁকে বেলে মাটি চোখে পড়বে। হাঁটু সমান ঘাস জেগে উঠে কাঁটা ঝোপের তলায় কার্পেটের মতো বিছিয়ে থাকে।

ওরা আশে পাশে ঘুরে ঘুরে ভালো করেই দেখলো। জঙ্গল আর পাহাড় ছাড়া বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। যীশু বলল, কাসিগাউ নাম যখন, তখন একটা দুটো সিংহ-টিংহ থাকা তো উচিত। কোথায় সিংহ দূরে থাক্ একটা হরিণ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনা।

জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে কোথাও আছে হয়তো। পূর্ব আফ্রিকার সিংহের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ওরা এক সঙ্গে দল বেঁধে থাকে।

আর সেই জন্য সিংহের দলকে প্রাইড বলে। কোন কারণে দলছুট হয়ে গেলে বা মানুষ মারলে সিংহ জঙ্গলে থেকে বেরিয়ে আসে। মাথার উপরে আকাশ বরফের মতো সাদা। এক টুকরো মেঘ নেই। একজন কবি বলেছিলেন, 'একফোটা মেঘ দিতে পারো সাহারার বুকে।' এই মুহূর্ত্তে চেনা আকাশের দিকে তাকিয়ে একফোঁটা মেঘ খুঁজে পাওয়া গেল না।

দিনের বয়েস বাড়ছে। আকাশের সূর্য ধীরে ধীরে তেজী হয়ে উঠছে। আফ্রিকার দারুন গরম—সকলেই জানে। বেলা দশটার পর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না। যতো বেলা বাড়ে রোদের তেজও বাড়তে থাকে। এক সময় মনে হয় যেন দিক বিদিক দাউ-দাউ করে জ্বলছে। উত্তপ্ত বাতাস সারা এলাকা দখল নিয়ে দাপাদাপি করছে। তা সত্ত্বেও মাসাই কুলির মুখে শুনল দক্ষিণ আফ্রিকার ১৩৬ ডিগ্রী গরমের কাছে এ নাকি পাত্তাই পায়না।

একটা বাওবাব গাছের ছায়ায় দাঁড়াল এসে ওরা। গরমের দিনে বাওবাব গাছ থেকে জল পাওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড গাছ-গুলোর ফাঁপা গুঁড়িতে বৃষ্টির জল জমে থাকে। তাকে গাছের স্বাভাবিক জলধারা বলা যায়।

কিন্তু সব মানুষের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা থেকে জীবন-প্রবাহ ঘুরে অন্যপথে চলে যায়। রাতারাতি বদলে যায় সব কিছু এই রকম একটা ঘটনা গোগোর জীবনে ঘটে গেল, হঠাৎই।

জলাশয় থেকে স্নান সেরে ফ্লাক্স-ভর্ত্তি জল নিয়ে যখন ফিরছে ওরা, তখন বেলা দুটো। দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার 'ভই' অঞ্চলের নিঃসীম নিস্তব্ধ প্রান্তর প্রচণ্ড নিদাঘে ঝিম ধরে আছে। তাঁবুতে যখন ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে আরও, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গোগোর কানে গেল সেই উত্তপ্ত প্রান্তরের মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বর ভেসে আসছে। স্বরটা কোন দিক আসছে

লক্ষ্য করে কিছুদূর গিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢোকার আগে একটা ইউকাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখলো। সামনেই উঁচু উঁচু গাছ তারই মধ্যে কাঁটা গাছের ঝোপ। একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। প্রচণ্ড রোদে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। এদিকে বাড়ী ঘর নেই বললেই চলে।

ওরা কিছুটা এগিয়ে গেল আরও। হঠাৎ হাইর‍্যাক্স পালের ডাক শুনতে পেল। এ-এক অদ্ভুত প্রাণী। গিনিপিগ খুব বড় হয়ে উঠলে যেমন দেখতে হয়। প্রচণ্ড রোদে-দগ্ধ হয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা। কিন্তু অস্ফুট আর্তনাদ থামেনি তখনও। জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে সেই করুণ আর্তস্বরটাই আছড়ে পড়লো ওদের বুকে। মাসাই কুলিটা জঙ্গলের পথ ঘাট চেনে। খুব সাহসী সে। কুলিটা অনেকদূর এগিয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে একটা বিধ্বস্ত বাড়ী তার চোখে পড়ল। গোগো পিছিয়ে পড়েছিল অনেকটা। যীশুর হাতে পিস্তল। একটা মোয়ানা গাছের কাছে আসতেই চমকে উঠলো গোগো। মোয়ানা গাছের গুঁড়ির গায়ে মাথা এলিয়ে কে একজন বসে আছে।

গোগো ছুটে গেল তার কাছে। ভাল করে দেখল। দেখে আঁত্‌কে উঠল। এ যেন মানুষেরই প্রেতাত্মা এক। লোকটা আমেরিকান, পরণে ছেঁড়া ফুল প্যান্ট ফুল সার্ট। এই প্রচণ্ড দাব দাহে গায়ে ছেঁড়া কোট তখনও রয়েছে। একমুখ লাল দাড়ি জঙ্গলের মতো বেড়ে উঠেছে, চোখ দুটো কোটরগত। মুখের আদলও বেশ সুশ্রী, দেহ যে বেশ লম্বা চওড়া ছিল বোঝা যায়। কিন্তু মনে হয় রোগে, কষ্টে ও অনাহারে অনিদ্রায় শরীর ভেঙে গেছে। লোকটা গাছের গুঁড়ির গায়ে মাথা রেখে হাঁফাচ্ছে। তার মাথার টুপিটা খুলে একদিকে পড়ে গেছে। গলার টাইটা মাটিতে লুটোপুটি—পাশে একটা ক্যাম্বিশের বড় ব্যাগ।

গোগো পরিষ্কার ইংরেজীতে জিগ্যেস করল, তুমি কে? কি উদ্দেশ্যে এসেছো এখানে?

লোকটা সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু মুখখানা করুণ করে বলল—একটু জল—বড্ড তেষ্টা। কাঁধের পাশ থেকে ফ্লাস্ক বের করে জল খাইয়ে দিল। হাতে অাঁজলা করে জল নিয়ে মুখে চোখে ঝাপ্টা দিল—একবার দুবার তিনবার। মাথায় জলের প্রলেপ দিল। ওদের খাদ্যের বরাদ্দ ছাঁটাই করে কিছু খাদ্য মুখের সামনে তুলে ধরলো। লোকটা একটু চাঙ্গা হলো বটে, কিন্তু শরীরটা কেমন লাল হয়ে গেছে! সারাটা শরীর খুব কাঁপছে। হয়তো পড়ে যাবে এখুনি। গোগো বুঝল লোকটার ম্যালেরিয়া হয়েছে। অনেক দিন জঙ্গলে জঙ্গলে থেকে অনিয়মে-অনিদ্রায়, অত্যধিক পরিশ্রমে আর অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে শরীরটা একেবারে শেষ করে ফেলেছে। গায়ের রঙ ঝলসে গেছে। পিঠ বেঁকে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি সে সুস্থ হবে না।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—তার নাম জিমি কার্টার। জাতে আমেরিকান। কিন্তু আফ্রিকার সূর্য্য তার রঙ ও জৌলুসটুকু চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে।

সন্ধ্যের আগেই ওকে তিনজনে ধরাধরি করে তাঁবুতে নিয়ে এল। কিন্তু ওর অসুখ দেখে গোগো পড়ল দুশ্চিন্তায়। এই পাণ্ডব বর্জিত জায়াগায় ডাক্তার নেই—বদ্যি নেই—রুগীর পথ্য নেই। কনস্ট্রাকসন সাইটের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জীপ গাড়ী আছে কিন্তু রাতের বেলায় রুগীকে ডাক্তার খানায় নিয়ে যাবে কে? কাসিগাউ থেকে মোম্বাসা অনেক দূরে।

গোগো আর যীশু রুগীর পাশে সারারাত জেগে রইলো। লোকটির শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে চলার শক্তি নেই। বিশ্রাম আর পথ্যের খুব প্রয়োজন। কথা বেশী হলো না, বেশি বলা গেল না, তবু সারারাত তার মাথার সামনে বসে মাথায় জল পট্টি দিল।

গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। আকুল স্পর্শ আর উৎকণ্ঠিত অনুভূতি অনেক সময় কথার চেয়ে বেশি কাজ দেয়।

ক্যাম্বিশের খাটে উপুড় হয়ে গোগো শুয়ে। অ্যালার্ম ঘড়ি টিকটিক শব্দে মহাকালের নাম জপ করে চলেছে। একটানা শব্দে তার মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। রাত তিনটের সময় রুগী উঠে বসল। বলল—একটু জল খাবো। তেষ্টা পেয়েছে।

লোকটা আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়েছে। শরীরের কাঁপুনিটা কমেছে। গোগো ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খাওয়াল ওকে।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে লোকটা এবার বলল, তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে না ? ইয়াং ম্যান, তুমি কার্টারকে চেনো না। লোকটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে একটু অদ্ভুত ভাবে হাসল। সে কিছুটা ক্লান্তি বশত বালিশের গায়ে মাথাটা এলিয়ে দিল। তার হাসি দেখে গোগোর মনে হলো তিনি একজন সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল অজস্র নীল নীল শিরা, চওড়া কব্জি আর লালচে এক মুখ দাড়ির নীচে চওড়া বুকের পাটা, সাহসী মানুষের আবেদন জানাচ্ছে। এতক্ষণ পরে অসুস্থ শরীরের খোলস ভেঙে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসছে যেন ধীরে ধীরে।

লোকটা বলল—তোমার নাম কি ? দেশ কোথায়—তোমার মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে। ছেলে বউ ঘর বাড়ী ছেড়ে আফ্রিকার জঙ্গলে ছুটে এসেছি অনেকদিন আগেই, বাইশ বছরেরও বেশী। আমি আর বাঁচবো না। আমার মন বলছে আমার জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। চলে যাওয়ার আগে তোমার একটা উপকার করে যেতে চাই। তুমি কলকাতার ছেলে—ইণ্ডিয়ান, এখানে নিশ্চয়ই চাকরির জন্য এসেছো। এই সামান্য পয়সার জন্য কতো কষ্ট স্বীকার করে এতদূর এসেছে যখন, তখন তোমার সাহস আছে—অসামান্য দৃঢ়তা আর মনোবল নিশ্চয়ই আছে। আমার অসমাপ্ত

কাজ তুমিই পারবে শেষ করতে। কিন্তু কথা দাও আমার মৃত্যুর আগে কারও কাছে তুমি সে গুপ্তধনের কথা প্রকাশ করবে না?

গুপ্তধন? নিজের মনেই কথাটা উচ্চারণ করল গোগো। আশ্চর্য হবার শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। বিস্ময় নয়, আনন্দও নয় এ-এক আশ্চর্য্য অনুভূতি। অনাস্বাদিত শিহরণ। রোমাঞ্চে সারা শরীর ভরে গেছে। কোথায় কেমন করে এ সংবাদ এতদিনে লুকিয়ে ছিল তা কে জানে। যা ছিল স্বপ্নের জিনিষ তাই যখন সত্যি হয়ে ধরা দিতে চাচ্ছে তখন সমস্ত রকম কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করার মতো মানসিকতা নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে সারা জীবন। গোগো সেই আশ্বাসই দিল।

লোকটা আরও একগ্লাস জল খেল। কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতো করে ঠোঁট মুছে সোজা হয়ে বসে বলল, ইয়ং ম্যান তোমাদের বয়েস কতো? আঠেরো কি উনিশ? তুমি যখন মায়ের কোলে কচি কচি হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছো—আজ থেকে ঠিক সতেরো বছর আগের কথা তখন আমি কেনিয়ার পাহাড়ে জঙ্গলে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন গায়ে শক্তি ছিল, বয়েস ছিল কম। দুনিয়ার কোন বিপদকে গ্রাহ্যই করতাম না।

দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার কাসিগাউ শহর থেকে লটবহর নিয়ে রওনা হলাম একাই। সঙ্গে নিলাম একটা উট। উটের দুধ ডিম আর মালপত্র বইবার জন্য। বেচুয়ানা রাজ্য পার হয়ে লিম্পোপো নদী ছাড়িয়ে ঙ্গামী হ্রদের দিকে চলেছি। লিম্পোপো ও ঙ্গামী হ্রদের মাঝে কালাহারী মরুভূমির এক ভাগ পড়ে। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে চোখে পড়ল একখানা বিশাল মাঠ। সেই মাঠে গাছপালা নেই। ছোট-ছোট ঝোপ ঝাড় গর্ত পাহাড়। ঘাসের জঙ্গল। ছোট-ছোট পাহাড় তারই মধ্যে বেদুইনের তাঁবু।

মাইল খানেক দূরে গোটা দুয়েক উটপাখী চরে বেডাচ্ছে।

হাতের রাইফেলটা তাক করতেই পাখীটা তার শত্রুকে দেখে ফেলেছে। পাখীগুলো এমন হিংসুটে যে শত্রুর ভয়ে পালাবার আগেই নিজের ডিম নিজেই ভেঙে ফেলল। উটপাখীর পালকের মতো ডিমের ও খুব আদর। প্রায় দু-কিলো ওজন। নিগ্রোরা তার মধ্যে জল ও দুধ রাখে। আরবীরা তার মধ্যে আলো জ্বালিয়ে চীনে লণ্ঠনের মতো ঝুলিয়ে রাখে।

চলতে চলতে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছানো গেল যেখানে এর আগে কোন আমেরিকান আসেনি। মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য পেটে ক্ষিদের আগুন। পায়ের নীচে উত্তপ্ত মাটি। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বালুকারাশি উড়িয়ে আকাশ ধোঁয়াসা করে শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে আসছে বালুঝড়। তখন মনে হয় এই শেষ। এ অবস্থায় চলা যাবেনা আর। একটু জল, একটু ছায়া, একটুকরো মাংস সেই মুহূর্তে দুঃস্বপ্নের মতো।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—কিংবা জঙ্গল পাহাড় দেখলেই সোনার সন্ধান করি। কিন্তু সোনা তখনও সোনার হরিণের মতো আমার নাগালের বাইরে, কতো লোকে কতো কি পেয়ে বড়লোক হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সে সম্বন্ধে কতো ইতিহাস পড়েছিলুম—সেই সব গল্পের সত্য মিথ্যে যাচাই করতেই আফ্রিকায় এসেছিলুম। কতো জঙ্গলে জঙ্গলে বৃথাই ঘুরে বেড়ালুম, কতো অসহনীয় কষ্ট সহ্য করলুম। একবার তো হাতের কাছে পেয়েও হারালুম।

অরেঞ্জ নদীর অববাহিকা ধরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা জায়গায় হঠাৎ অনেক গুলো লোক দেখে অবাক হয়ে গেলাম —যার মধ্যে কালো চামড়ার নিগ্রো, সাদা চামড়ার বুয়রতো ছিলই। এছাড়া ইউরোপের অনেক লোক হীরে খুঁজে রাতারাতি বড়লোক হবার চেষ্টায় হন্যে ঘুরছে। অরেঞ্জ আর ভাল নদীর অববাহিকা থেকে কিছু দূরে এক নতুন জায়গা, নাম এল

ডোরাডো।' কেপটাউন থেকে প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে, যানবহেন বলতে গরুর গাড়ী না হলে শ্রীচরণ ভরসা, চল্লিশ দিনের ও বেশী লাগে। সেখানে পৌঁছেই নদীর খাতে খানিকটা জায়গা বেছে নিয়ে শুরু করলাম খোঁড়াখুঁড়ি। একা আমি নয়। হাজার হাজার মানুষ শাবল, গাঁইতি নিয়ে নেমে পড়েছে। দু একজন ভিড়ের মধ্যে সুবিধে না করতে পেরে নদী থেকে দূরে ডাঙা জমির দিকে গেল। ভাবটা—দেখাই যাক্‌না এখানে কিছু পাওয়া যায় কিনা। হঠাৎ দেখা গেল হীরে অন্বেষীদের একজন কাটা পাঁঠার মতো মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে তার বুকে নাকি প্রচণ্ড ব্যথা, শাবল গাঁইতি ছেড়ে ছুটে এলো নিগ্রোরা সবাই, দাপাদাপি কমেনি তখনও। লোকটার ঘাড়ে নাকি ভূত চেপেছে—ওকে মেরে না ফেললে ভূত ছাড়বে না।

আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম অত্যাধিক পরিশ্রমেই ওর বুকে ব্যাথা হচ্ছে। আমি ওকে জিগ্যেস করে জানতে পারলাম সে একজন চাষী মাঠে চাষ করাই তার কাজ। হঠাৎ হীরের গন্ধ পেয়ে লাঙ্গল তুলে রেখে হাতে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে ছুটে এসেছে কিন্তু এত পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে কেন?

এক ডোজ ওষুধ দিতেই ওর বুকের ব্যথা উবে গেল। আমার সঙ্গে জীবনদায়ী কিছু ওষুধ ছিল। খুশী হয়ে নিগ্রোরা আমাকে যত্ন করল খুব। ওদেরই একজনের বাড়ীতে দিন সাতেক অতিথি হয়ে কাটালাম। বিভিন্ন জাতের গ্যাজেল আর অ্যাণ্টেলোপ শিকার করে আগুনে ঝলসে মাংস খেতাম। বিদায় নেবার দিন নিগ্রো সর্দার বলল, তোমরা তো এখানে পাথর খুঁজতে এসেছো, না? আচ্ছা, তোমাকে একটা পাথর দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। একটু পরে সে ডুমুর ফলের মতো একটা শাদা পাথর এনে আমার হাতে দিল। আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—এই তো সেই হীরে। খনির উপরের পাথরে মাটির স্তর থেকে পাওয়া পালিশ না করা হীরের টুকরো।

নিগ্রো সর্দার বলল—দেখছো কি এটা তুমি নিয়ে যাও। ঐ যে অনেক দূরে বড়ো পাহাড় দেখছো, যার মাথার উপর থেকে ধোঁয়া উঠছে। এখান থেকে কয়েক শো মাইল হেঁটে গেলে ওখানে পৌঁছে যাবে। ঐ পাহাড়ের নীচে এই রকম শাদা পাথর অনেক আছে।

নিগ্রো সর্দারের কথা শুনে আমি মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম —দূরের সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে জায়গাটা হলো রিখটারস্‌ভেল্ড আর চিমনামানি পার্বত্য এলাকা। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ংকর, দুর্গম বিশাল বিপদ সঙ্কুল অঞ্চল। দু একজন দুধর্ষ ভৌগোলিক অভিযাত্রী ও বিজ্ঞানী ছাড়া কোন সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ সেখানে পড়েনি। সেই বিশাল জঙ্গলে-পাহাড়ের অধিকাংশ জায়গাই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তার ম্যাপ নেই, শেষ নেই তার কোথায় কি আছে বলতে পারবে না কেউ।

সব কিছু শুনে আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল, অচেনাকে চেনার আনন্দ, অজানাকে জানার আগ্রহে আমার রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম ওই অরণ্যসঙ্কুল পর্বতমালা আমার অভ্যর্থনা প্রতীক্ষায় বিপুল রত্ন সম্ভার তার গোপন গহ্বরে নিয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। ওখানে আমি যাবোই। আমার মৃত্যুর আগে সমগ্র মানব জাতির কাছে খুলে দেব বিশাল রত্ন ভাণ্ডারের এক সিংহদুয়ার।

দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে হীরের সন্ধানে অনেকেই এসেছিল ১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ নদীর ধারে এক বুয়র চাষী ড্যানিয়েল জ্যাকবের খামার ছিল। চাষ বাস করেই দিন কাটত। জ্যাকবের ছোট্ট ছেলে অরেঞ্জ নদীর ধারে খেলতে খেলতে একদিন কুড়িয়ে পেল সাদা পাথরের ছোট্ট একটা নুড়ি। বাড়ি দাওয়ায় অযত্নে ফেলে রাখা নুড়িটি প্রতিবেশী শাল্ক ভ্যান নিকার্কের চোখে পড়ল। নিকার্কের অবচেতন মনে উঁকি দিল, এটা সামান্য নুড়ি নয় হয়তো

কোন মূল্যবান পাথর। পরে জানা গেল ওই নুড়িটাই বাইশ ক্যারেটের নিষ্কলঙ্ক হীরে আর সেখানেই পাওয়া গেল মস্ত এক হীরের খনি। এই রকম অনেক গল্প আমি শুনেছি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় হীরে পাওয়া যাবে এ কথা আগে ভাবতো না কেউ। তাই প্রথম পাওয়া সেই হীরেটির নাম দেওয়া হলো—ইউরেকা। খেলার ছলে হেলায় পাওয়া সেই হীরেটির দাম খুব বেশী একটা না হলেও এ যেন অফুরন্ত পাওয়ার এক সংকেত মাত্র। শুরু হলো ডায়মণ্ড রাশ। আম জনতার হীরে খোঁজার ঝোঁক বেড়ে গেল আরও, স্ফুলিঙ্গ থেকেই তো দাবানল সৃষ্টি হয়। ইউরেকা যতই ছোট হোক ইউরোপ থেকে হীরের টানে চলে এলো কত লোক শুরু হলো কেপ কলোনী। অরেঞ্চ এবং ভাল নদীর মাঝে সৃষ্টি হলো অরেঞ্চ ফ্রিস্টেট।

কার্টার এই পর্য্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। গোগো খুব সহজেই কৌতুহলের রাশ আলগা করে দিয়েছে, এ ধরনের কথা কখনো শোনেনি আর। অনাহারে মৃতপ্রায় জিমি কার্টারের মলিন পোষাক, নীল নীল শিরা বের করা হাত, ঝামা ঘষা মুখের রঙ আর লাল ভুরু জোড়ার নিচে আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দুনিয়াকে শাসন করার মতো বেপরোয়া একটা ভাব দেখতে পেল, ত্যাগের মহিমায় দীপ্তিশীল মানুষ বটে একজন। গোগোর মন শ্রদ্ধার ভালবাসায় ভরে উঠল।

কার্টার বলল—আর এক গ্লাস জল। জলপান করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে শুরু করলো, আফ্রিকার বেশির ভাগ হীরে পাওয়া যায় তানজানিয়া, ঘানা, গিনি, লাইবেরিয়া আর সিয়েরালিওন থেকে।

এই দেশের পশ্চিম উপকূলে লাইবেরিয়া আর গিনির মাঝামাঝি প্রায় বাহাত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে সিয়েরালিওন, রাজধানী ফ্রিটাউন। আঠোরো শতকের শেষে শিঁকল ছিড়ে ক্রীত

দাসেরা এখানে এসে বসবাস করেছিল। সিয়েরালিওন মানে শৃঙ্খল মুক্ত।

উনিশশো তিরিশ সালে এক ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানী রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে দেখলেন যে পাথরটায় হোঁচট খেয়েছেন সেটা একটা আকরিক হীরে এবং সেখানেই উঁকি দিল হীরের উৎস। প্রায় আট হাজার বর্গ মাইল জুড়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করলেন। পাহাড় নদী জঙ্গলে ভরা সিয়েরালিওন, গিনি আর লাইবেরিয়া সীমান্তে এসে মিশেছে।

আমি সেই ঘোর বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম! স্পষ্ট বোঝা গেল এটা একটা আলাদা জগৎ। কতো বড়ো বড়ো গাছ, বড় বড় ফার্ণ, নানারকম অর্কিড, লায়না, স্থানে স্থানে নিবিড়, দুর্গম মোয়ানা গাছের জঙ্গল। গাছের মাথায় মাথায় লতায় পাতায় এমন চাবড়া বেধে আছে যে সে জঙ্গলে কোন জন্মে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অন্ধকার এখানে গায়ের জোরেই সূর্য্যকে আড়াল করে দীর্ঘমেয়াদী রাজত্ব করে চলেছে। নিঃশব্দ জঙ্গল বলতে বা বোঝালেও আসলে অনেক রকম শব্দ আছে। কিচকিচে পাখির ডাক, হাওয়ার শোঁ শোঁ, লুকানো কাঠ বেড়ালির চিড়িক চিড়িক, ঝিঁঝিঁর কোরাস, শুকনো পাতার খস্ খস্, দূরে কোথাও কাঠ কাটার একটানা শব্দও ভেসে আসছে—তবু মনে হয় জঙ্গল নিঃস্তব্ধ। আর ওই সব শব্দ গুলো নিস্তব্ধতারই অলংকার। জঙ্গলে ঢুকলে সত্যিকারের এক বিশাল বস্তুকে অনুভব করার অভিজ্ঞতা হয়।

তিন চার দিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। সঙ্গের খাবার ফুরিয়ে এসেছে। প্রতিদিন একটা করে ইল্যাণ্ড (হরিণের মতো এক প্রকার জন্তু) আমার পেটের খাণ্ডব বনে প্রবেশ করতো। কোথায় একটা উঁচু পাহাড় থেকে জঙ্গলের চারিদিকে ছোট বড়ো

ঝরণা নেমে এসেছে, ঝরণার জল আজলা করে নিয়ে তৃষ্ণা মেটাতাম। কিন্তু এতেই একদিন হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেলাম। বনের মধ্যে কাঠ-কুটো পুড়িয়ে ইল্যাণ্ডের ঝলসানো মাংস খাবার আয়োজন করছি, তার একটু আগেই তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরণার জল পান করেছি। ছুরি দিয়ে মাংস কেটে গাছের পাতার উপর সাজিয়েছি ঠিক সেই মুহূর্তে বমি হতে লাগল। বমি শুধু নয়। পেটে ব্যাথা হতে লাগল। অসম্ভব ব্যথা। আমার কাছে মাইক্রোস্কোপ ছিল। পরীক্ষা করে দেখলাম জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। তা হলে কি ঝরণার জল পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে নেমে এসেছে নিশ্চয়ই। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা। যে জলে তৃষ্ণার্ত মানুষ তৃষ্ণা মেটায় আবার সেই জলেই নিয়তি ওৎ পেতে বসে আছে।

একটু দূরেই হাইর‍্যাক্স পালের ডাক শুনতে পেলাম। এ এক অদ্ভুত প্রাণী। শব্দটা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই ঘাসবন শুরু হলো। উঁচু উঁচু ঘাস রোদে ঝল্‌সে লাল হয়ে গেছে, তার মধ্যে কোথাও দু চারটে অচেনা গাছে ফুল ধরেছে লাল-রঙা ঢেউ উঠেছে হাওয়ায়। দুটো ফড়িং নিজেদের মধ্যে ভাব করে কোনক্রমে সেই একটা ফুলে বসার চেষ্টা করছে অথচ ওইটুকু ছোট ফুলে দুজনের বসার জায়গা নেই, শেষ পর্যন্ত ওরা দুজনে মারামারি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে—আবার এসে বসছে সেই একই ফুলে।

ঘাস বনের মধ্যেই প্রকাণ্ড একটা ধূসর রঙের পাথর, পাথরটার মাথার উপর ঠিক ছাতার মতন একটা ইউকা গাছ। ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই, তা সত্ত্বেও ওই পাথরটার উপরে একটু বসে দু দণ্ড জিরিয়ে আবার শুরু করবো ভেবে পাথরটার দিকে এগোলাম। সকাল দশটা বাজেনি, তবু এর মধ্যেই রোদ চড়া হয়ে উঠেছে। এদিকে খুব একটা নিবীড় জঙ্গল নেই, অনেকদূর পর্য্যন্ত

কাঁটা গাছের ঢেউ খেলানো ঝোপ। সেই ঝোপের উপর ইস্পাতের তরয়ালের মতো ঝক্ ঝক্ করছে রোদ্দুর। এক ঝাঁক উড়ন্ত বুনো হাঁস আকাশের নীল তরঙ্গে স্নানের বিলাস উপভোগ করে উধাও হলো কোথাও। দূরাগত ট্রেনের শব্দ বাতাসের তরঙ্গে আছড়ে পড়ল।

জঙ্গলের মধ্যে এলে হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীটা যেন ঘুরছে না। সময় এখানে স্থির হয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটা অচল হয়ে গেছে। ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া নানা রকম পাখী ও প্রজাপতি। কীট পতঙ্গ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। হিংস্র বন্যজন্তুরা সাধারণত এই সব জঙ্গলে থাকেনা।

দূরে রিখটারসভেল্ড পর্বত শ্রেণীর একটা শাখা পর্বত আমাদের চোখের সামনে উঁকি দিল, তার অবস্থান এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, তা সত্বেও সেখানে পৌঁছুবার আগে একটা বিস্তীর্ণ জঙ্গল উপত্যকায় গিয়ে তাঁবু ফেললাম, একটা ক্ষীণতোয়া নদী পাহাড়ের গা চিরে নেমে এনেছে। নদী দেখে আমার আনন্দ হলো। এই সব নদীর পারেই তো কতো ভূ বিজ্ঞানী খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে।

নদীর তীরে আমি বালি পরীক্ষা করে বেড়ালাম, কিন্তু কোথায় সোনা। সোনার একটা রেণু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে। একটু একটু করে হতাশার মধ্যে তলিয়ে গেলুম। এই আমি জঙ্গলের মধ্যেই কি নিঃশেষ হয়ে যাবো। প্রায় বারো চোদ্দ দিন কেটে গেছে। ইল্যাণ্ডের মাংস অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমি চিন্তা করছি হয়তো এই জঙ্গলেই আমার প্রাণবয়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আগামী দিনের মানুষের কাছে—মানব জাতির কল্যাণের কাজে আমার অঙ্গীকার কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? আমার সঙ্গী সাথীদের বললাম আর কেন সর্দার, চল এবার ফিরে যাই। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনি আমাদের জন্য নয়। আমরা খুঁজে পাবো

না। সোমালি কুলি বলল—রিখটারসভেল্ড পর্বতের অনেক শাখা প্রশাখা আছে। সেই দিকেই চলুন।

একদিন একটা পাহাড়ী নদীর পার দিয়ে চলতে চলতে পাথরের নুড়ির মধ্যে হলদে রঙের ছোট্ট একটা পাথর আমি ও সোমালি কুলি এক সঙ্গে দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা বালি খুড়ে বের করলাম। আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। আমার সঙ্গী বলল—সায়েব, কষ্ট এতদিনে সার্থক হল, ভাল করে দেখুন।

আমি দেখলাম। সঙ্গী সাথীদেরও দেখালাম। ওদের বললাম হীরে তো পেলাম কিন্তু হীরের খনি কোথায় ?

পাথর খানা হয়তো নদী স্রোতে ভেসে এসেছে। অবশ্য এ ধারণাটা হলো এই বিশাল পর্বত শ্রেণীর কোন অজ্ঞাত দুর্গম কন্দরে হীরের খনি আছে। হয়তো স্রোতে ভেসে এসেছে তার বিশাল স্তরের একটা টুকরো মাত্র। আসলে সেই খনি খুঁজে বের করতে হবে।

জাম্বেসী নদী পার হয়ে তিন দিনের পথ পিছে ফেলে সামনেই একটা মিশমিশে কালো পাহাড় দেখতে পেলাম। পাহাড়টা মেঘ ফুঁড়ে আকাশ ছুঁয়েছে। সে দিকেই এগিয়ে গেলাম। কি গভীর জঙ্গল। খুব কাছের থেকেও কিছু দেখা যাচ্ছেনা। গাছে লতায় পাতায় আকাশ ঢেকে গেছে। সূর্যের আলো পৌঁছয় না। সে যেন চির অন্ধকার দেশ। একটা স্যাঁত সেঁতে ভাব। আমাদের গা ছম ছম করতে লাগল। বনের মধ্যে আবার বড় বড় গর্ত। গর্তের মধ্যে জল। এমন বন— তবু একটা প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই, এমন কি একটা পাখীর ডানার আওয়াজ পাওয়া যাচ্চে না। হঠাৎ তার মধ্যে একটা আর্তনাদ শুইতে পেলাম। রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলাম সেই দিকে আমার হাতে টর্চ ছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকে টর্চের আলোয় দেখলাম একটা নিগ্রো শিকারীর ক্ষত বিক্ষত দেহ জঙ্গলের

মধ্যে পড়ে আছে। কোন ভীষণ হিংস্রজন্তু তার মুখের সামনে থেকে তলপেট পর্যন্ত ধারালো নখর দিয়ে চিরে ফেঁড়ে দিয়েছে —অনেকটা পুরনো বালিশ ছিড়ে ফেঁড়ে তুলো বের করে দিলে যেমন হয়। অচেনা নিগ্রো লোকটার দেহ ফাঁকা জায়গায় বের করে এনে রাইফেল হাতে এদিক ওদিক খুঁজলাম। হঠাৎ কোন এক অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্নে মাটির উপরে তার পায়ে চারটি আঙ্গুল। গাছের কয়েকটা বড় বড় ডাল রাগে আক্রোশে ভেঙে রেখে গেছে। পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর গিয়ে একটা গুহার মুখে এসে পদ চিহ্ন মিলিয়ে গেল।

নিগ্রো ছোকটার মৃতদেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ওকে সমাধিস্থ করে ক্রশ চিহ্ন দিয়ে স্পষ্ট রেখে এলুম।

শেষ পর্যন্ত আমি আর রিখটার্সভেল্ড পর্বতের দিকে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। তখন কেপ নিয়ে ইংরেজ আর ওলন্দাজ চাষীদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। বুয়র যুদ্ধের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। কেপ ইংরেজদের দখলে এলো। যুদ্ধের হিড়িকে গা ঢাকা দিলো। কেপ ছেড়ে বুয়রেরা শুরু করল উত্তর দিকে লঙ মার্চ। স্বাধীন নাটাল রাজ্য বুয়রদের জন্য গড়ে উঠল। কিন্তু সেখানেও ইংরেজদের আক্রমণ সেই যুদ্ধে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। স্বজাতি আর স্বদেশের স্বার্থে জীবন পণ করে যুদ্ধে গেলাম বুয়রদের স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠল ট্রান্সভ্যালে। আমি ফিরে এলাম কিন্তু কথায় বলে গোঠের বাঁশী যাকে ডাক দিয়েছে কি করে সে ঘরে থাকবে। যুদ্ধ থেকে ফিরে বছর দুয়েক শান্ত জীবন ভোগ করার পর ভালো লাগলো না ; আবার বেরিয়ে পড়লাম। শরীরে শক্তি নেই বয়েস হয়ে গেছে, দিন ফুরিয়ে এসেছে আমার। মাই ডিয়ার গোগো এই ম্যাপখানা তোমাকে দিয়ে গেলাম আমি। রিখ্‌টার্সভেল্ড পর্বত ও যে নদীর পারে হীরে পেয়েছিলাম

মোটামুটি তার বর্ণনা আছে। আমাকে কথা দাও সেখানে তুমি যাবে। তোমার সাহস আছে। বুয়র যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার তানজানিয়া, ঘানা, গিনি, লাইবেরিয়া আর জাইরে থেকে অনেক হীরের খনি পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা যেখানে হীরে পেয়েছিলুম সে খবর কেউ জানে না। আফ্রিকার মানচিত্রে খনিজ সম্পদের স্থান হিসেবে নতুন একটা নাম সংযোজিত হবে। রিখটারসভেল্ড পর্বতের হীরের খনি, নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। সাহস থাকলে যেও তুমি, একদিন বড় মানুষ হয়ে যাবে।

বলতে বলতে জিমি কার্টার অবসন্ন ভাবে গাছের গুঁড়ির গায়ে মাথাটা এলিয়ে দিল।

গোগো আর যীশুর সেবাযত্নে জিমি কার্টার সেরে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু চিরকাল যে পথে পথে জীবন কাটিয়েছে তাঁবুতে তার মন বসবে কেন? একদিন সে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল, গোগো সেই মুহূর্তে বলল· তোমার অসুখের সময় যে সব কথা বলেছিলে মনে আছে তো···সেই হীরের খনি ?

কার্টার অবাক হয়ে গেল। জ্বরের ঘোরে অনেক কথা বলেছেন এখন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বললেন না। কেমন চুপচাপ করে থাকেন আর নিজের মনে কি সব ভাবেন। গোগোর কথার উত্তরে কার্টার বললেন, আমি কি বলেছিলাম মনে নেই তবে হীরের খনির কথা যখন বলছো তখন আলেয়ার পেছনে ছুটবার সাহস তোমার আছে তো ?

গোগো বুক চিতিয়ে বলল···সাহস আছে কিনা কাজেই প্রমাণ হবে সেটা। এখুনি তৈরী হতে বললে, সাইডিংয়ের কাজে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলবো। কার্টারের কপালে অনেকগুলি ভাঁজ পড়ল। মুহূর্তকাল দুটি চোখ বুঁজে কি ভাবলেন তারপর যখন চোখ খুললেন তাকে তখন অন্যরকম মনে হল। অনেকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন···আগে ভেবে দ্যাখো। যারা সোনা হীরে খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় লক্ষ্য স্থানে পৌঁছুতে পারে না। আমি একটা বুয়র ছেলেকে দেখেছি সে কখনো কিছু পায়নি। তবে প্রত্যেক বারেই বলতো, এই পেয়েছি, এইবার অব্যর্থ সন্ধান। দশ বছর ভেল্ডের ধূ-ধূ প্রান্তরে ঘুরে শূন্য হাতে মরুভূমির উত্তপ্ত বালির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

গোগোর তরুণ তাজা মন দুঃসাহসের গন্ধ পেয়ে এগিয়ে গেল

দুই বন্ধু ফন্দী এঁটে একদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল। জাম্বেসী নদী পার হয়ে কিসমু ভিক্টোরিয়া হ্রদের স্টীমারে চড়ে ভই অঞ্চলের কাসিগাই জঙ্গলের দিকে রওনা হলো।

পথে এক জায়গায় একটা হাট চোখে পড়ল। কালো পাথরের মতন মজবুত স্বাস্থ্য নিয়ে নিগ্রো মজুরেরা বিকিকিনি করছে। ওদের পরনের পোষাকগুলো আশ্চর্য রকমের ফরসা। কারুরই পোযাক ময়লা নয়। জঙ্গলে থাকে, কুলির কাজ করে কিন্তু ধুলোবালি মেখে থাকে না। এমন কি ওদের শরীরের চক্‌চকে চামড়া দেখলে মনে হবে···ওদের গায়ে এক বিন্দু ময়লা নেই। আফ্রিকার বান্টু কুলিরা অনেক সভ্য।

যারা জঙ্গলে শিকার করতে আসে কিংবা খনিজ পদার্থ সন্ধান করতে আসে তারা প্রকাশ্যে নিগ্রো কুলিদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে না। এই সব অঞ্চলের হাটে-বাজারে, রেল লাইনের কাছে অনেক সোমালি কুলি থাকে। তারা সোয়াহিল ভাষায় কথা বলে। সোয়াহিল মেয়েরা ছেঁড়া শাড়ি পরে শাম্বায় (ভূট্টা ক্ষেতে) কাজ করে। কেউ তাদের দিকে চেয়েও দেখে না। ওরা মাটির মানুষ! সরল প্রকৃতির। শহর সভ্যতার মানুষ দেখলে ভয় পায়। সভ্য মানুষেরা আফ্রিকার জঙ্গলে আসে আনন্দ লুটতে। বনের পশু পাখী হত্যা করে এক ধরনের পৈশাচিক আনন্দ নিয়ে ফিরে যায়। শহুরে বাবু দেখলে চেনে ওরা। কিন্তু এই দুজন— এরা নতুন লোক, বয়েস অনেক কম। এরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সোমালি কুলি-গুলোকে দেখছে। যীশু একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো মসৃণ পাথরের মতো লোকটার দিকে।

গোগো বলল, হঠাৎ যেন এদের দেখলে আগেকার সেই ক্রীতদাস দাসীদের বাজারের কথা মনে পড়ে। ওরা যেন নিজেদের বিক্রী করার জন্য বসে, যদি কোন বাবু কেনে।

যীশু বলল, চলনা, আমরা গোটা দুয়েক কিনে নিয়ে যাই, এখানকার পথঘাট তো চেনা ওদের।

—উঃ। এ সব বাজে কথা বলিসনি, ওরা কিন্তু সাংঘাতিক. এটা সত্যি আশ্চর্য লাগে, ওরা ঠিক মতো খেতে পায়না। তবু ওদের ভরাট স্বাস্থ্য, কি প্রাণবন্ত হাসি। দিব্যি তো নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলছে।

দুই বন্ধুতে চলে যাবার জন্য পিছু ফিরতেই সোমালি কুলিরা কি একটা কথায় এক সঙ্গে হেসে উঠলো, ওদের মধ্যে তিন চারজন মেয়ে কুলি ছিল। এক জনের পিঠে আবার বাচ্চা, কাপড়ের ফেরতা দিয়ে বাঁধা। হাসির ধমকে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়লো, একটা বাচ্চা মেয়ে হাতের ঝুড়িটা উলটো করে মাথায় বসিয়ে সোডার বোতলের মতো ভসভসিয়ে হাসতে লাগল। যীশু অনেকবার পিছু ফিরে নিজের ঠোঁটে সেই হাসির প্রতিচ্ছবি তুলে অস্ফুট স্বরে বলল, আশ্চর্য।

গোগো আবার বলল, সত্যি কুলি-মজুরদের গায়ের রঙ আর যাই হোক, হাসিটা ওদের হিরোর মতন।

যীশু বলল, হীরোর মতন? তুই কটা হীরোকে হাসতে দেখছিস রে? নিজের চোখে একটাও দেখেছিস? আফ্রিকান সফারি দেখেছি। স্যার এইচ. জি. হাণ্টারের বই পড়েছি।

চলার পথে ওরা সোজা রাস্তা দিয়ে না এসে মেঠো রাস্তাই ধরে ছিল, দেখা গেল দূর থেকে কে একজন ছুটতে ছুটতে ওদের দিকেই আসছে। কাছে আসতেই দেখতে পেল জিমি কার্টার।

আপনি! দুজনেই একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ আমি। স্টীমার থেকে নেমে, ভিক্টোরিয়া হ্রদের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম হয়তো তোমদের দেখা পাবো, তাই চলে এলাম। শোন, এখান থেকে মোয়ানজা বন্দর ছাড়িয়ে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবারো বন্দরে দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়ে টাঙ্গানিকা

হ্রদের তীরবর্তী উজিজি বন্দর পাবে। হ্যাঁ একটা কথা, টাঙ্গানিকার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় খুব সতর্ক থাকবে। মাচাকোস জেলায় পাওলিপিডিস আর লঙ্গিপেনিস নামে দু জাতের মাছি আছে বড় সাইজের হর্সফ্লাইয়ের সমান যাদের আকৃতি। সেই মাছি কামড়ালে স্লিপিং সিকনেস হয়। এই জেলার মাকুয়ানি অঞ্চলই হলো আফ্রিকার সবচেয়ে বড় গণ্ডারের ঘাঁটি। ট্যাবোরা থেকে মোয়ানজা পর্যন্ত সিংহের ভয়ও খুব বেশী। এরা খুব মানুষ খেকো। কার্টার এই কথা বলে একটু চুপ করলেন। তোমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো। বলতে বলতে কার্টার কেমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গোগোর মনে হল একটা অপসৃয়মান ছবির মতো কার্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

উঁচু উঁচু ঘাস-বনের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। এঁকে বেঁকে চলে গেছে। যীশু বলল, খুব সাবধান, এই সব জঙ্গলেই সিংহের আড্ডা; বেশি দূরে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

গোগোর সংগে বন্দুক আছে। যীশু একটু ছটফটে। সে পকেটে হাতড়ে কিছু পেল না। ওর ধারণা কলকাতা থেকে আসার পথে কিছু একটা অস্ত্র নিয়ে এসেছে। প্রয়োজনের সময় সেটাকে হাতের সামনে না পেয়ে কাঁধের কীটস ব্যাগটা পুরো উল্টে দিল। জামা কাপড়, শুকনো খাবার, টিফিন বাক্স, সব কিছু বেরিয়ে পড়ল কিন্তু সকলের শেষে চোখে পড়ল একটা খাপশুদ্ধ বড় ছোরা। খাপ খুলে ছোরার সরু দিকটা পরখ করে গোগো বলল, দারুণ তো এটা?

যীশু সেটা হাত থেকে তুলে নিয়ে কাল্পনিক শত্রুকে লক্ষ্য করে বলল, সামনে এলে খতম করে দোব। গোগো বলল এত বড় ছোরা সঙ্গে থাকলেই কাজে লাগতে পারে। ডেঞ্জারাস! গোগো বন্দুকটা শূন্যে তুলে বলল, আমার হাতে 'ক্রাকশট'। অর্থাৎ একটা গুলি ফসকাবে না। কিন্তু জানিস, সিংহ যখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ট্রিগার টেপার সময় পর্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যে হবার আগেই ভেল্ডের এক নিঃসীম প্রান্তরের মধ্যে রাতের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটাল। যীশু বলল, সামনে তো কোন লোকালয় দেখতে পাচ্ছিনা। ভেল্ডের নিঃসীম প্রান্তরে পাতলা অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন পথে চলা ঠিক নয়।

একটা মোয়ানা গাছের তলায় কাঠ কুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাতের খাবার তৈরী করতে বসল। খাবার বলতে খুব সংক্ষিপ্ত আয়োজন। ইল্যাণ্ডের ঝলসানো মাংস। সারাদিন পরিশ্রমের পর পেটের মধ্যে খাণ্ডব বন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল ওরা। বিছানার এক পাশে চার ব্যাটারীর হান্টার টর্চ, আর দোনালা বন্দুকটা রাখলো হাতের কাছেই। যীশুর চোখে ঘুম আসছে না। হাত দুটো কপালের উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে নিদ্রাদেবীর ধ্যান করছিল। সারাদিন পরিশ্রমের টুকরো টুকরো ছবি বন্ধ চোখের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল।

অনেক রাতে গোগো ডাকল—এ্যই যীশু, ওঠ। যীশু তড়াক করে এক লাফে বিছানায় উঠে বসল। গোগো বলল—কি একটা জানোয়ার তাঁবুর চারপাশে ঘুরছে, রেডি, ফায়ার।

সত্যি একটা ভীষণ হিংস্র জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের পর্দার বাইরে শোনা যাচ্ছে। তাঁবুর সামনে রাতের বেলায় যে আগুন করা হয়েছিল তার মৃদু আলো আঁধারিতে সুবৃহৎ মোয়ানা গাছটাকে প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গোগো রাইফেল নিয়ে বাইরে আসতেই যীশু হাত দিয়ে ঠেকিয়ে দিল। পরক্ষণেই জানোয়ারটা তাঁবুর গায়ে হিংস্র নখের থাবা বসাতেই ভেতর থেকে রাইফেল গর্জে উঠল। একবার নয়। দু বার। কিন্তু তার আগেই হাতের ছোরাখানা অতর্কিতে জানোয়ারটার গায়ে বসিয়ে দিলো গোগো।

হান্টিং টর্চের আলোয় ভেল্ডের মরুময় নিঃসীম প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠল। অন্ধকারের হাত থেকে অনেকটা জায়গা দখল নিয়ে বনভূমি যেন জ্যোস্নায় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠল।

এবার জন্তুটাকে স্পষ্ট দেখা গেল লাল চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। চোখা চোখা দাঁতগুলো রাগে যন্ত্রণায় বেরিয়ে পড়েছে। নিস্ফল আক্রোশে নিজের লোমশ হাতখানা দিয়ে চাওড়া বুকের উপর ধুম ধুম করে ঘুঁষি মারছে। এক একবার মোয়ানা গাছের প্রকাণ্ড একটা ডাল ভেঙে দাঁত দিয়ে কামড়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। হুঙ্কার ছাড়ছে প্রচণ্ড জোরে। পরক্ষণেই আবার তেড়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সামর্থ নেই জানোয়ারটার। দু দুটো বুলেট ওর হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করে চলে গেছে। মৃত্যুর সঙ্গে বীভৎস্যভাবে পাঞ্জা কষেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ঘুরে পড়ে গেল। তা সত্ত্বেও দমে যাবার পাত্র নয়। দু হাতের উপর ভর দিয়ে শিকারীর দিকে লাফিয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল, চাঁদি সামলাও মহারাজ। গোগো আগে থেকেই ট্রিগারে হাত রেখে পা দুটো ছড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে গরিলাটার মাথার খুলি উড়ে গেল। এবার উঠবার সামর্থ রইল না আর। বিশাল জন্তুটা উপুড় হয়ে গোঙাতে লাগল—ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তারপর সবশেষ। পেটের একপাশ থেকে ফিনকি দেওয়া রক্তের ফোয়ারা ঠেলে ছোরাটা টেনে বার করল যীশু।

গোগো আকাশের দিকে চেয়ে বলল—রাত অনেক। ওটা ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাক্। চল্ আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

দু জনে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে লাগল—একটু পরে গোগো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল যীশুর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ততক্ষণে সে উড়ে গেছে ঘুমের দেশে। ঘুমের সঙ্গে নাকের গর্জন শুরু হয়েছে। গোগোর চোখে ঘুম এলোনা। অনেকদূরে সিংহের

গর্জন শুনতে পেল। নিশুতি রাতের নিঃস্তব্ধতা গুঁড়ো গুঁড়ো করে সেই গর্জন গোগোর বুকে এসে আছড়ে পড়ল। পাশেই তার এক মাত্র বন্ধু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে নাক ডাকার শব্দ আসছে। টাঙ্গানিকা অঞ্চলের সিংহের হিংস্রতার জুড়ি নেই। সে কি ভীষণ গর্জন। সিংহের ডাক আগেও শুনেছে কিন্তু এ রাতের সেই ভীষণ গর্জন তার অনেকদিন মনে থাকবে। হয়তো মানুষের সাড়া পেয়ে যেন এক যোগে জেগে উঠেছে ওরা।

গোগো আবার উঠে বসল। নিজের মনেই বলল—নাঃ ঘুমুলে চলবে না। রাইফেল তাক্ করে বসে থাকতেই হবে। বিপদ কখন আসবে বলতে পারে কে? সাবধানে থাকতেই হবে।

কি দুর্যোগের রাত্রি। তাঁবুর আগুন নিভে গেছে। বাইরে কালো মিশ মিশে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের তাঁবুর ভেতরে হুঁ হুঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস ভাঙছে। অনেকদূর থেকে সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছে। নির্জন নিশুতি রাতে একলা জেগে থেকে মনে হচ্ছে সিংহটা বুঝি খুব কাছে এসে গেছে।

ধীরে ধীরে পূবের আকাশটা ফর্সা হলো। ছানার জলের মতো স্বচ্ছ রোদ উঠল। তাঁবু তুলে দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা।

পাঁচ

দিন সাতেক পরে গোগো আর যীশু টাঙ্গানিকা পার হয়ে আলবার্টভিল নামে একটা শহরে এলো। এখান থেকে কাবালো পর্যন্ত রেলপথ আছে। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে সানকনি যেতে হবে সানকনি থেকে কঙ্গোনদী ছড়িয়ে একশো মাইল ভেতরে বিশাল ট্রপিক্যাল অরণ্য ও মরুভূমি অঞ্চল দিয়ে রিখটারস ভেল্ড পর্বতের দিকে যেতে হবে।

স্টীমার ঘাটা ছাড়িয়ে সর্ট-কাট দিয়ে না এসে ওরা পাকা রাস্তায় হাঁট ছিল, সহসা দূর থেকে একজন লোক ছুটতে ছুটতে ওদের দিকেই আসছে ..কাছে এসে হাসি মুখে বলল—হ্যালো কোথায় যাবে? মনে হচ্ছে টাঙ্গানিকায় এই প্রথম? আমাকে চেনো না নিশ্চয়ই। চিনবে কি করে আর আমার নাম দিয়াগো কুপারেজ। বুয়র যুদ্ধের আগে কেপ কলোনী অঞ্চলে আমার প্রথম বসবাস। আমি একজন বর্ণসঙ্কর ওলন্দাজ। সামনেই রেষ্ট হাউস আমার আছে আপনারা যে এখানে এসেছেন সেটাই আমাদের সৌভাগ্য, এ সব জঙ্গলে সাধারণত কেউ আসে না। কেনিয়া, নাইরোবী, কাসিগাউ কোথায় যাবেন বলুন?

গোগো চেয়ে দেখল লোকটার মুখে একটা দুষ্টু হাসি খুব আলগা ভাবে লেপ্টে আছে। লম্বায় ছ ফুটেরও বেশী, চেহারা খানা বেশ কদাকার কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, বুকের দুধারে দু তাল থ্যাবড়া মাংস, মাথার টুপিটা ভুরু পর্যন্ত টানা বুক চিতিয়ে হাঁটে, দেখে শক্তিশালী মনে হয়।

যীশু বলল—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম। লোকটা ওদের আপদ মস্তক দেখে নিয়ে বলল···তুমি দেখছি কালো

মানুষ, ইণ্ডিয়ান? তা হলে আমার সঙ্গে চলো থাকার ব্যবস্থা আছে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ডিশ···বলে লোকটা একটু হাসল।

গোগো ওর হাসি দেখে মতলবটা বুঝতে পারল, বলল···সঙ্গে তাঁবু আছে আমাদের। লোকটা এবার মুখে চোখে বিনীত ভাবের ভান করে বলল। তা তো থাকবেই, এতদূরে তৈরী না হয়ে আসে কেউ আর। আমি বলছি মানে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরুবেন।

ওর পীড়াপিড়ি দেখে আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে গোগোর অসুবিধে হলোনা অতিথি আপ্যায়নের নাম করে আগন্তকের সর্বনাশ ওরা করে। এটাও ডাকাতির একটা কৌশল।

যীশু পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল যে আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে খাবার আছে। আশাকরি আপনার প্রয়োজন হবে না।

যীশুর উত্তরটা ওর মনঃপুত হয়নি। লোকটা পরমুহূর্তে কি একটা ভেবে আরও কাছে একটা এগিয়ে এসে এক হ্যাঁচকায় জামার ভেতর থেকে কি একটা অস্ত্র বের করল। বুকের সামনে রিভলবার ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে বললো ভালোকথা কানে গেল না। আপনাদের কালো মানুষকে এই রিভলবারের গুলিতে শেয়াল কুকুরের মতো পথে ঘাটে কতো মেরেছি। আমার নিয়ম হচ্ছে, এই পথ দিয়ে কেনিয়ার জঙ্গলে যারা যাবে তারা আমাকে প্রণামী দেবে। না হলে এই রিভলবারের একটা গুলিই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

গোগোর স্নায়ু গুলো একলাফে সজাগ হয়ে উঠল। ততক্ষণে হাত-পা শক্ত হতে শুরু করেছে। শরীরের কোষে কোষে প্রতিবাদের একটা যন্ত্রনা দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। নিরীহ মানুষের উপর চড়াও হয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া, এই অমার্জনীয় অপরাধ তার ভিতরকার মানুষটার নজরে পড়ে। মৃত্যুকে সে পরোয়া করেনা।

উত্তেজনায় গোগোর শরীরটা লাল হয়ে গেছে। কানের দুপাশে

যেন কির্‌কির্‌ করে লোম গজিয়ে উঠেছে একটা অমানুষিক শক্তি তার অনুভূতির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড একটা সিংহের মতো কেশর দুলিয়ে গর্জে উঠেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে বাজখাঁই গলায় কে বলল···এই সামলাও। গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল।

গোগো আর যীশু দুজনেই চমকে উঠল। পরক্ষণেই দেখা গেল বদমায়েসটার হাতের পিস্তল মাটিতে পড়ে গেল। কার্টার উইন-চেষ্টার রিপিটারটা নামিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললো—এর নাম চরিত্র, বুঝলি? আমার চরিত্র তা হলে এখনও দেখিসনি? দুটো অচেনা ছেলেকে পেয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছিলি! যীশু ততক্ষণে পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে।

কুপারেজ মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলো—আর সে কখনো নিরীহ মানুষের বুকে ছোরা কিংবা পিস্তল তুলবে না। গুণ্ডামী বদমায়েসী করে পরের টাকা পয়সা লুটপাট করবে না আর। তার শিক্ষা হয়েছে। এখানেই সব শেষ। আর নয় কেপ কলোনী ছেড়ে চলে যাবে সে। গোগোর মধ্যে যে পশুটা মাথা চাড়া দিয়েছিল এতক্ষণ পরে সে পালিয়ে গেছে কোথায়। একটা দয়ার্দ্র অনুভূতিতে সমস্ত কাঠিন্যতা গুঁড়ো গুঁড়ো হতে শুরু করেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে অবাক হয়ে গিয়েছিল সম্বিৎ ফিরতেই আশ্চর্য হয়ে বলল—আপনি? কার্টার আরও কাছে সরে এসে বলল···আমার অসুখের সময় একদিন তুমি আমাকে সেবা করেছিলে। সেই ঋণ শোধ করতে পারবো না, ভেল্ডের দুর্গম পথে প্রতি মুহূর্ত বিপদ, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর হাতছানি। তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। তাই ছুটে এলাম। হয়তো লক্ষ্য স্থানে পৌঁছুতে পারবো না তবু যতটুকু পথের শরিক হওয়া যায় তাতেই আনন্দ পাবো আমি।

গোগোর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। তিনদিন পরে ওরা এসে

সানকানি পৌঁছুল। সেখান থেকে আবার রওনা হলো. জঙ্গল এদিকে খুব বেশী নেই কিন্তু ধূ ধূ প্রান্তর। মানুষজন নেই বললেই চলে। শুধু চোখে পড়ে ছোট বড় পাহাড়। নৈবেদ্যের উপরে কলার টুকরোর মতো পাহাড়ের মাথায় ইউফোবিয়া গাছের ঝোপ। কিন্তু গোগোর মনে হল আফ্রিকার এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবেদন বড় অপরূপ। বেশ ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন ভরে গেল। সূর্যাস্তের রঙ জোছনা রাতের আলো এই দেশকে অপরূপ রূপকথার মায়াবী রাজ্য করে তোলে।

কার্টার বললে···এই ভেল্ড অঞ্চলে জ্যোস্নার আলোতেই বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে পথেই মরণ হয়েছে কতো মানুষের।

কথাটা যেদিন বললো তার পর দিনই গোগো জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে প্রাণের দোসর যীশু। উইন চেষ্টার রিপিটারটা যীশুর হাতে। জঙ্গলের পথে একমাত্র রক্ষা কবচ ওটাই।

দুই বন্ধুতে কথা বলতে বলতে অনেক দূরে এগিয়ে গেল। এক ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরল। জলের সন্ধান পেল না। এক সময় ওদের কথার ফাঁক দিয়ে সূর্য্য ডুবে গেল ছোট্ট একটা পাহাড়ের আড়ালে।

ওরা দুজনে পাহাড়টাকে পেছনে রেখে ছুটতে শুরু করলো জঙ্গলের নিঃস্তব্দতা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগলো। ততক্ষণে ভেল্ডের নিঃসীম প্রান্তরে অন্ধকার নামছে। সেই অন্ধকার কেউ কাউকে দেখতে পেলনা, শুধু পায়ের শব্দ, দিন রাত্রির সন্ধিক্ষণে এ রকম পায়ের শব্দ জঙ্গলে খুব একটা শোনা যায় না, মুখের সামনে হাত দু খানা চোঙার মতো করে গোগোর চিৎকার করে ডাকল যীশু··যীশু, যীশুর সাড়া নেই। যীশু তুই কোথায়? কোথায় গেলি? একটা গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে বাজপাখীর মতো ধারালো দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখল চারিদিকে ভেল্ডের নির্মেঘ আকাশে তখন দু চারটে তারা ফুটিফুটি শুরু করেছে। চাঁদ ওঠেনি কিন্তু পাতলা অন্ধকার নেমেছে।

ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে বুনো ঝোপের কোল ঘেঁষে আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরে সে অনেক দূরে তাকাবার চেষ্টা করল সামনে অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে না কিছু।

গুঁড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলো সে। লতার ঝোপে পা আটকে গেল গোগোর। হাতের আঙ্গুলে কাঁটা ফুটেছে। মুহূর্ত কাল কান পেতে কি যেন শুনলো। কোনও কোন শব্দ নেই। কিন্তু কোথায় যীশু। একটু পরেই ঝোপের আড়ালে কি একটা শব্দ হলো সে দিকে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে একটা মানুষের শরীর পেয়ে গোগো চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে যীশু বলল, আমি, আমি।

গোগো এবার কোমরের দু পাশে হাত রেখে পা দুটো একটু ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, যীশু তার আগেই বলে ফেলল, বেশ মজা লাগছে মাইরি, ইয়া—হু, আমাকে টার্জন টার্জন লাগছে না-রে। গোগো আমাকে ধর, হাতে কাঁটা ফুটে গেছে। ধ্যুৎ তেরি। কাঁটা ফুটছে বয়ে গেছে, আবার জঙ্গলে ঢুকেছিলি কেন ?

তেমন বেশি লাগেনিরে গোগো বলতে বলতে যীশু শুয়ে পড়ল। একটা ইউফোরিয়া গাছের গুঁড়ির উপর শুয়ে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। পিঠের তলায় ভিজে বালি আর শুকনো পাতার পরশে ভারী আরাম লাগছে। মনে হলো কতকাল এ রকম ভাবে শোওয়া হয়নি। দেহ মন যেন এর প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল। কোন আলাদা গন্ধ নেই, চারিদিক থেকে একটা বুনো গন্ধ ভেসে ভাসছে। এই অন্ধকার জঙ্গলে আকাশের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে থেকে একটা মাদকতা অনুভব করলো। গোগো কেন এতো ছটফট করছে যীশু জানে। ওর মনের কষ্ট আর দুঃখ শহরে যা গোপন রেখেছিল, এই অরণ্যে এসে আরও বিশাল মহৎ ব্যাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্ত সংকীর্ণতা উধাও হয়ে গেছে।

হঠাৎ এক ঝলক প্রবল আলো এসে যীশুর মুখে চোখে চোখে পড়ল। গোগোর হাতে চার ব্যাটারীর একটা হান্টিং টর্চ ছিল। টর্চের আলোর ঝলকানিতে যীশুর দীর্ঘ, শায়িত দেহটা একবার দেখা গেল। কিন্তু গোগোর চোখ সে দিকে ছিল না। হঠাৎ ডুমুর ফলের মতো কি একটা চোখে পড়তেই দৌড়ে গিয়ে তুলে নিয়ে দেখল, পাথরের টুকরো ছাড়া কিছু না। ওটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, উঠে পড় যীশু। দ্বিতীয় পাথরটা অনেকদূরে ছুঁড়ে দিল। সেটা পড়ল ডানদিকের ঝোপটার মধ্যে, হঠাৎ সেখানে কাঁচভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দ হলো। ওরা চমকে দুজনেই ঘুরে তাকাল।

টর্চ ছিল গোগোর হাতে। সেই দিকেই আলো ফেলল। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা বাড়ি দেখা গেল। পায়ে পায়ে সে দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা ভাঙাচুরো বাড়ি, ছেঁড়া বিছানা, সাপের খোলস—দেখলে নির্জন বাড়ি বলে বোঝা যায়। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে নাচ-গানের আওয়াজ ভেসে এলো।

খুঁজতে খুঁজতে ওরা একটা ঘরে ঢুকলো। ঘন পালিশ প্রাচীন সব আসবাব পত্র, তাদের ভিড়ে কেবল দুটো বাতি জ্বলছে। ঘরের এক পাশে একটি যুবতী মেয়ে আলোর দিকে চেয়ে আছে, পরনে রাইডিং ক্লোক আর হাতে ধরা হাল্কা টুপির প্রান্ত। সোনালী চুল আর সমুদ্র নীল চোখ দেখে এক ঝলক স্মৃতি গোগোর মনের আকাশে বিদ্যুদ্বেগে উড়ে গেল। এমনি এক গ্রীষ্মের দিনে উনিশ শো বাহান্ন সালের মাঝামাঝি সময়ে যুবরাণী এলিজাবেথ কয়েকজন রাজ অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে এই জঙ্গলে শিকারে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট। 'ট্রী টপ্‌স' নামে একটি গ্রন্থে যুবরাণীর শিকার বিবরণী লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তারপর থেকেই ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারেরা শিকারের নেশায় কেনিয়া, নাইরোবী আর উগাণ্ডার জঙ্গলে লোকজন নিয়ে শিকার করতে আসে। এই মেয়েটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

যীশু ঘড়ি দেখতে ভুলে যায়। সেই সময় একটা মেয়ে ঘরে ঢুকলো। একটা অদ্ভুত ধরণের ব্লাউজ পড়েছে মেয়েটা…যার কনুই পর্যন্ত হাতা…সেখানে ফ্রিল দিয়ে ফুলের মতন তৈরী করা, গলার কাছটাও ফুলফুল ধরণের, গত শতাব্দীর মেমসাহেবদের মতন দেখতে মেয়েটাকে। শিকারীদের সঙ্গে সেও এসেছে। সারা দিনের দুর্ভাবনা ও উত্তেজনা ভুলে গিয়ে গোগো তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

ছয়

প্রায় তিনমাস ধরে রোডেশিয়া ও এঙ্গোলার সীমানা ছড়িয়ে ভেল্ড পার হয়ে দূরে ধোঁয়ার মতো পর্বত শ্রেণী দেখা গেল। কার্টার ম্যাপ খুলে বলল…ওই খানে আমাদের যেতে হবে। পথ অনেক বিপজ্জনক কিন্তু উপায় নেই। আফ্রিকার এইসব খোলা জায়গায় দাঁড়ালে অনেক দূরের জিনিষ চোখে পড়ে।

গোগো তাঁবুর কাছে আগুন করে বসে আছে। ওর পাশে যীশু। ওই যে দেখছো রোডেশিয়ার ভেল্ড অঞ্চল। ওখানে অনেক হীরে পাওয়া যায়। কিম্বার্লির হীরের খনি নাম ভূগোলে নিশ্চয়ই পড়েছো? ওই সব খনির আনচে কানাচে হীরের টুকরো কতো লোক পেয়েছে। হীরের লোভে কতো লোক এখানে আসে।

কথা শেষ না হতেই কার্টার চমকে উঠল…ওরা করা?

গোগো আর যীশু দুজনেই সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। তাঁবুর বাইরে এসে বলল কোথায় কে?

কিন্তু কার্টারেয় দৃষ্টি শক্তি এত তীব্র যে একটু পরে কয়েকটা অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত্তি চোখে পড়ল। ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। গোগো বলল, এ্যাই যীশু বন্দুক রেডি কর।

একটু পরেই উইনচেষ্টার রিপিটার নিয়ে যীশু বেরিয়ে এল। কার্টার গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করলো। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সিগারেট ধরালো। লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল…ওই যে আসচে ওরা। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর সামনে দাঁড়াল। গোগো চেয়ে দেখল কয়েক জন মিশমিশে কালো রঙের মানুষ—বেঁটে, নাক থ্যাবড়া ..চোখ দুটো ছোট। মানুষ না বলে… মানুষেরই এক প্রেতাত্মা বলা যায় ওদের। রোগা…কদাকার

চেহারা। মুখ ভর্ত্তি লোমে ঢাকা। পরনে নেংটির মতো, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালকের টুপি হাতে ছোট ছোট তীর ধনুক। তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মূর্ত্তি। কার্টার জুলু ভাষায় বললে—কি চাই তোমাদের? কথা শুনে ওরা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর সব হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে এল।

কার্টার ইশারা করে বলল—বড় বিপদ। খুব হুঁশিয়ার গোগো ওরা পিগমী জাতীয় নর খাদক মানুষ। বেলজিয়াম কঙ্গোর উত্তর পূর্ব দিকে ইতুরি বন আছে। সেই বনেই একসঙ্গে বাস করে ওরা। গভীর জঙ্গলে থাকে, পিগমিরা চাষবাস করে না। শিকার করে আর ফাঁদ পেতে বন্য ওকাপি ধরে। ডিক্ ডিক্ আর বানরের মাংস পচিয়ে খায়। ওই যে দেখছো তীর ধনুক ওটাই মারাত্মক একটা অস্ত্র। পোকা-মাকড়ের পচা শরীর থেকে এক রকম বিষ তৈরী করে সেই বিষ তীরে মাখিয়ে ওরা শিকার করে। সাধারণতঃ খাদ্যের টান পড়লেই জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসে ওরা। যে কোন সভ্য গভর্মেণ্টের আইন এখানে অচল। তীরের ডগায় এমন বিষ মাখিয়ে ছুঁড়ে মারবে—যাতে মৃত্যু অনিবার্য। চলো আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে। চটপট, তাঁবু গুটিয়ে তৈরী হয়ে নাও।

চলতে চলতে তিন দিন পরে একটা খুব বড়ো পর্বতের পাদমূলে ঘন জঙ্গলের মুখে এসে পড়ল। জায়গাটা যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। জঙ্গলের একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। সত্যিকারের জঙ্গল বলতে যা বোঝায় তাকে এক রকম ভূতুড়েই বলা চলে। সেখানে কোন শব্দ নেই। আসলে অনেক রকম শব্দ আছে। হাওয়ার শোঁ—শোঁ, লুকানো কাঠবেড়ালীর চিড়িক চিড়িক শুকনো পাতার খস খস—দূরে কোথাও কাঠ কাটার একটানা শব্দ ভেসে আসছে…তবু মনে হয় জঙ্গল নিস্তব্ধ। আসলে ওসব

নিস্তব্ধতারই অলঙ্কার। জঙ্গলে ঢুকলে মানুষ সত্যিকাজের একটা বিশাল জিনিসকে খুব কাছে থেকে দেখতে পায়।

কার্টার বলল, খুব সাবধান গোগো…জঙ্গলে চলাফেরা করা অভ্যেস নেই খুব সহজেই সে পথ হারাবে। অনেক শিকারী জঙ্গলের জালে জড়িয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। মরুভূমির মতো এ সব জায়গায় পথ হারাবার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ সব জায়গাই এক রকম। ভালো বুশম্যান না হলে ওই জঙ্গলের জালেই জড়িয়ে যাবে। বন্দুক না নিয়ে এক পাও বেরুবে না। এটা মনে রাখবে দক্ষিণ আফ্রিকার বন তোমাদের গড়ের মাঠ নয়।

গোগো জিগ্যেস করল…সাহেব তার কতদূর ?

কার্টার একটু হেসে বলল…এ রকম আর ও দু তিনটে পাহাড় জঙ্গল পার হতে হবে। সবশুদ্ধ পাঁচ থেকে ছয় হাজার মাইল গেলেও এ বন পাহাড় শেষ হবে না। এই বিশাল দুর্গম ট্রপিক্যাল অরণ্যে এখনও কতো ভয়ঙ্কর জানোয়ার আছে যার খবর অনেকেই রাখে না। সভ্য মানুষ খুব কমই এখানে এসেছে।

১৮৮০ সালে জেমস্ মার্টিন বলে একজন অনুসন্ধানী রোডেশিয়ার এই অঞ্চলে অনেক দিন ঘুরছিলেন সোনার সন্ধানে। একবার তো সোনার খনির সন্ধান পেয়েও হারিয়েছিলেন। মিষ্টার মার্টিন একজন সুদক্ষ ভূ ও প্রাণীতত্ত্ববিদ ছিলেন। ইনি একটা অদ্ভুত জন্তু দেখেছিলেন। জানোয়ারটা আকৃতিতে অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরস্ জাতীয় সরীসৃপের মতো প্রকাণ্ড বড়ো। রোডেশিয়ার কোভিরাঙ্গো হ্রদের সীমানায় জল থেকে মুখ তুলে জানোয়ারটাকে উঁকি মারতে একবার দেখেছিলেন।

গোগো বলল, তুমি কোন অদ্ভুত জানোয়ার দেখনি ?

বন্য ওকাপি দেখেছি। বেলজিয়াম কঙ্গোর উত্তর পূর্ব দিকে ইতুরি বনে…বন্য ওকাপির সন্ধান পেয়েছি। এটা এক অদ্ভুত জন্তু জিরাফ জাতীয় কিন্তু তার চেয়ে একটু ছোট আর ঘাড়টাও একটু

খাটো। ওকাপি হলো আফ্রিকার সবচেয়ে ভীরু আর দুর্লভ জন্তু। বিশেষ করে পিগমীরাই ওকাপির মাংস পছন্দ বেশী করে।

মাংসের লোভ পিগমীদের এত বেশী যে হাতির দাঁতের চোরাকারবারীরা পিগমীদের কাছ থেকে একতাল মাংসের বিনিময়ে বহুমূল্য হাতির দাঁত সংগ্রহ করে সেগুলি বিদেশের বাজারে বিক্রী করে হাজার হাজার টাকা উপায় করে।

স্কটল্যাণ্ড দেশীয় বিশ্ব বিশ্রুত শিকারী স্যার জে, এ, হান্টার এক অত্যাশ্চর্য জিনিষ দেখেছিলেন যেটা মানব সমাজের সবচেয়ে জঘন্য কলঙ্ক হয়ে থাকবে। গোগো জিগ্যেস করল···কী সেটা?

মানুষের মাংস মানুষও যে খায় সেটা শুনেচো?

যীশু বলল, শুনেচি।

কিন্তু হান্টার সায়েব ঘটনাটা চোখে দেখেছেন, পূর্ব আফ্রিকার এক জঙ্গল থেকে শিকার করে সায়েব ফিরছেন, ঠিক সেই সময় দেখলেন একজন শ্বেতাঙ্গ প্রহরী অনেকগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের ধরে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের গলায় একটা করে লোহার শিকল বাঁধা, পরস্পরের মধ্যে তিন ফুটের ব্যবধানে। সায়েবের আশ্চর্য লাগল প্রহরীকে জিগ্যেস করে তিনি শুনলেন নর-খাদক হিসাবে তাদের শাস্তি দিতে নিয়ে চলেছে।

মাংসের নেশা অনেক উপজাতির মধ্যেই অত্যন্ত বেশী এবং এর থেকেই হয়তো কোনদিন নর মাংসের প্রতি লোভ জন্মানোও বিচিত্র নয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির মধ্যেই নর মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল ধর্মের অঙ্গ হিসেবে নয়। পঞ্চাশ বছর আগেও নাকি প্রায়ই দেখা যেত কোন ক্রীতদাসকে গ্রামে বেঁধে রাখা হয়েছে আর খরিদ্দারেরা তাকে টিপে টুপে দেখছে মাংস হিসাবে সে কেমন···অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীদের বাজারে গিয়ে মাংস পরীক্ষা করে দেখার মতো আর কি। অনেক সময় দেখা যেতো পুরো মানুষটা কেনবার খদ্দের জুটছেনা, বিক্রেতা তখন তার শরীরের

বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন খদ্দেরের কাছে বিক্রী করছে, প্রত্যেক খদ্দের ছাই দিয়ে তার কেনা অংশটা চিহ্নিত করে তার উপর নিজের চিহ্ন এঁকে দিত। বেচারা ক্রীতদাসকে কখনো সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই অবস্থায় কাটাতে হতো। যতো দিন না তার দেহের অপেক্ষাকৃত অবাঞ্ছনীয় অংশগুলিও বিক্রী হচ্ছে তারপর তাকে মেরে ফেলে ভাগ করা হতো। কাটার একটু থামলেন আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেবে এসেচে। সেই আবছা আলো অন্ধকারের মধ্যে গোগোর মনে হলো হুঁদে কার্টারের মুখের চেহারা কেমন পাল্টে গেল। কার্টার যেন নিজের অজ্ঞাতসারে চারদিকের নির্জন জঙ্গলে রহস্যে ভরা দুর্গম পর্বত মালার দিকে একবার চেয়ে দেখল, কোন কথা বলল না। যেন এই পর্বত জঙ্গলে অনেক দিন পরে এসে কোন বিভীষিকাময় পুরনো ঘটনা ওর মনে পড়েছে·· স্মৃতির পাখির পিঠে চড়ে উড়ে গেছে অতীতের আঙিনায়।

কার্টারের মতো সাহসী লোক ভয় পেয়েছে গোগো সে কথা ভাবতেও পারে না কিন্তু সেই ভয়ের হাত থেকে গোগোরও রেহাই নেই। ভয়টা ওর পিছু ছাড়বে না। এই সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র রহস্যময়ী অরণ্য, এই বিশাল পর্বত প্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে অনাদি অনন্তকাল ধরে আত্মগোপন করে রেখেছে।

রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা ভারতের দেবতাত্মা হিমালয় নয়— এদেশের বান্টু, জুলু, মাসাই, পিগমী, আরুশা, মাটাবেল প্রভৃতি উপজাতিরা কতো লোকের বলি গ্রহণ করেছে ওই নর-খাদক নিষ্ঠুর রিখটারসভেল্ড। সে ছাড়বে না কাউকে।

সাত

চলতে চলতে তিন দিন কেটে গেল আরও। গভীর জঙ্গল বলতে যা বোঝায় – ওরা ক্রমশ সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। সে যেন এক চির গোধূলির রাজ্য। এমন কি দুপুর বেলাও সূর্যের আলো দেখা যায় না। মানুষ জনের সাড়া শব্দ নেই। গাছের মাথায় মাথায় লতা পাতায় চাবড়া বেঁধে আছে। পথ কোথাও সমতল নেই। শুধু চড়াই আর উৎরাই তারই মধ্যে উঁচু উঁচু টুসক ঘাসের জঙ্গল। জল নেই বললেই চলে। ক্ষীণতোয়া ঝরণা এক আধটা যদিও দেখা যায় কিন্তু সেই জল অপেয়। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও জল ছোঁয়া যাবে না। তৃষ্ণায় কষ্ট হচ্ছিল গোগোর। একটু জলের খোঁজ করছিল। কে দেবে জল! টুসক ঘাসের ঝোপের ভেতর থেকে ছোট্ট কয়েকটা ডিক্ ডিক্ বেরিয়ে আসছিল আর আচমকা এমন তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠছিল যে শুনলে ভয়ানক চমকে উঠতে হয়।

যীশু বা কার্টার কারো মুখে কথা নেই। উত্তুঙ্গ পথে চলার পরিশ্রমে দুজনেই ক্লান্ত। শুধু মাত্র গোগো তখনও ইস্পাতের মতো মজবুত। দুজনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস ওঠানামা করছে। যীশুর কষ্ট আরও বেশী কলকাতার মতো জনবহুল শহরে সে মানুষ হয়েছে। জঙ্গলে পাহাড়ের চলার অভ্যাস ছিল না তার।

যীশু ভাবছে, কার্টার কখন বিশ্রাম করতে বলবে। সে চলতে পারছে না আর; কিন্তু যদি সে মরেও যায় তবু বলবে না যে, সে পারছে না আর। কতো অভিযাত্রী ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধানে কতো দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিল। সকলকে টেক্কা দিয়েছিল এক ফরাসী অভিযাত্রী—হ্যারি দ্য উইণ্ডট। উনিশে ডিসেম্বর উনিশ শো এক

তারিখে প্যারিস থেকে যাত্রা করে ২৫শে আগষ্ট ১৯০২ তারিখে নিউইয়র্কে পৌঁছেছিল। সম্পূর্ণ স্থল পথে উনিশ হাজার মাইল পার হয়েছিল।

এই দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চল অভিযানে এসেছিলেন মিশনারি ডাক্তার ডেভিড লিভিংস্টোন। ১৮৭৩ সালের ১লা মে এখানেই তিনি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লিভিংস্টোনের সমাধির সামনে মুহূর্তকাল নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অক্ষয় আত্মার প্রতি ওরা শ্রদ্ধা জানাল।

পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই, উত্তাপ ও নেই—তার বদলে আছে শুধু শুকনো পাতা ও পচাপাতার ধ্বংস স্তুপ। এই সব জঙ্গলে যুগ যুগ ধরে পাতার রাশি ঝরে পড়ছে, কোথাও বা গাছে গুড়ি, তার উপর শ্যাওলার স্তর জমছে। মাটির আস্তরণ পুরু হয়ে উঠছে আবার তার উপর ঝরা পাতার রাশি জমছে। গাছের ডালপালা আবর্জনা জমেছে। কোথাও বা জমা পাতার স্তুপ পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে।

কার্টার বললে, এই সব জায়গায় খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। এমন জায়গা আছে যেখানে চলতে চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে বেঘোরে পরে ঢুকে ডুবে যেতে পারো? সময় মতো উদ্ধার করতে না পারলে পচা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়াটা কিছু অসম্ভব নয়।

অনেক দূর গিয়ে বুনো ফুলের মেলা দেখতে পেল। লাল টক্‌টকে ইরিথ্রিনা ফুলের সমারোহ। ইমোপিয়ালতার ফুল। ভেরোনিকা ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

একটা বিচিত্র রঙীন পাখির পালক উড়তে এসে পড়লো রঙীন বেগোনিয়া ফুলের ওপরে। যীশু এগিয়ে গিয়ে পালকটা কুড়িয়ে নিলো। কোন পাখির পালক সেটা দেখার জন্য চেয়ে দেখলো এদিক ওদিক। পাখিটাকে খুঁজে পাওয়া গেলনা। যীশু অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে গেল কিছুটা।

ফুলগাছ গুলোর সীমানা পেরিয়ে একটা পাথরের উপর গিয়ে বসল। রঙীন পালকটা নিজের মুখে বুলোতে লাগলো। পালকটা যেন ফুলের মতো, নাকের কাছে সেটা এনে যীশু শোঁকার চেষ্টা করলো। কোন পাখির গন্ধ সেটাতে লেগে নেই।

শাদা ভেরোনিকা ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দুটো ফড়িং একসঙ্গে একটা ফুলের ওপর বসার চেষ্টা করছে। ওইটুকু ছোট ফুলের ওপর দুজনের বসার জায়গা নেই, ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে···আবার বসছে সেই একই ফুলের ওপরে আরও তো ফুল রয়েছে, তবু ঐ একটা ফুলের উপরে বসবার জন্যই দু জনে দাপাদাপি করে মরছে। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যীশু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মেঘের রাজ্যে ফুলের বন। মাঝে মাঝে শাদা বেলুনের মতো অলোক পুঞ্জ গাছের পাতায় পাতায় ঝুলে রয়েছে আবার কখনো বা ভাসতে ভাসতে আরও নীচুতে নেমে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিচ্ছে, জল ভরা মেঘের গাঢ়ো ছায়ায় চরাচর ছেয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আগেই সমগ্র অরণ্য অঞ্চল জুড়ে অন্ধকার নেমেছে। তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বেলেছে। সেই আগুনের আলোর সামনে ওরা তিন জনে বসে আছে। কার্টার বিষণ্ণ মুখে ম্যাপ দেখছিল। বলল···শোন গোগো, একটা কথা ভাবছি। এতদূর এগিয়ে এলাম, কিন্তু এখনো পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাবো। আর কতোদূর যাবো? যদি ধরো আমরা লক্ষ্যস্থানে না পৌছতে পারি?

কথাটা গোগোও ভেবে দেখেছে। সে আজও চলতে চলতে মাঝে মাঝে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে উপরের দিকে দেখার চেষ্টা করেছে কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সে আবার বলল সায়েব ম্যাপটা ভাল করে দেখুন। কার্টার হাতের ম্যাপখানা দেখিয়ে বললেন···এখানা স্যার ফিলপো ভো ফিলিপের তৈরী ম্যাপ,

যিনি পর্তুগীজ আশ্রিত কেপ কলোনীতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পশ্চিম আফ্রিকার ফার্ডিনাণ্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রিখটারসভেল্ড পর্বতের হীরের খনি একাকার পৌঁছুতে পারেননি। সেই দুর্জয় খনি শৃঙ্গের ছবির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেটা এখনও অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ তাঁবুর বাইরে একটা আওয়াজ শোনা গেল। হাঁপানী রোগী কাশতে কাশতে গলার ভেতরে যেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ঠিক তেমন শোনাল। একটু পরেই শব্দটা থমকে গেল। কিন্তু সেটা যে মানুষের গলা নয়, শোনা মাত্র কার্টার সেটা বুঝতে পারল। মানুষের গলার আওয়াজ ওই রকম চাপা ও গম্ভীর হয় না।

রাইফেল হাতে ব্যস্ত ভাবে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো। গোগো তাড়াতাড়ি উঠে ওর পিছু পিছু এলো। যীশু আশ্চর্য হয়ে বলল···সায়েব, কিসের শব্দ ওটা, বলে কার্টারের দিকে চাইতেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার মুখটা কেমন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শব্দটা শুনেই হয়তো?

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা জানোয়ারের পেছন দিকটা চোখে পড়ল। চেহারাটা না বানর···না মানুষ জাতীয়। সারা গা কালো লোমে ঢাকা। পালোয়ানের চেয়েও চওড়া পিঠ, পেশীওয়ালা লম্বা দু খানা হাত, মুখ খানা দেখা গেল না, পেছনের পা দুটো শরীরের অনুপাতে ছোট। জানোয়ারটা যে প্রচণ্ড হিংস্র-গায়ে অসুরের চেয়ে বেশী শক্তি বেশ বোঝা গেল। একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ভেঙে রাগে ও হিংস্রতায় কামড়াতে কামড়াতে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তিনজনেই কিছুটা চুপচাপ। একটু পরে কার্টার বলল, আগুনে কাঠ দিয়ে উস্কে দাও। বন্দুকটা লোড আছে কি না দেখ। টর্চের আলো জ্বেলে দেখে নাও। কার্টারের কথাগুলি শুনে গোগো কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাতের দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও জঙ্গল ঘন অন্ধকারে ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন প্রেতপুরীর মতো দেখাতে লাগল, তখন ওর মনে হলো·· এই অচেনা দেশে দুর্গম পর্বতের মাথায় বীভৎস্য হিংস্রজন্তু সঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিশি পাওয়া মানুষের মতো কোন গুপ্তধনের সন্ধানে যা তার চেয়ে ভয়ংকর মৃত্যুর দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছে ওরা? কার্টার তো কেউ নয় তার কথা শুনে কেন সে এত কষ্ট-দুঃখ; কষ্টময় পথ বেছে নিলো। হীরের খনিতে দরকার নেই আর। কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ ব্যস্ত মানুষের চিৎকার গাড়ী-ঘোড়ার মিছিল-ফুটবল মাঠের উন্মাদনা অনেক ভাল ছিল। গোগোর মন ফিরে যেতে চাইছে বাড়ীর দিকে। মাসী-মেসোমশাই খেলার সাথী আর প্রিয় বন্ধুদের মুখ সবই যেন অনেক দূরের কোন অবাস্তব স্বপ্ন··রাজ্যের জিনিস। গোগোর স্মৃতিতে এরা ছায়ার মতো, এখন অমাবস্যা রাতে প্রান্তর পাড়ি দেওয়া ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা সারি সারি টেলিগ্রাফের খুঁটির মতো ক্রমপলায়মান অস্পষ্ট।

ওরা চলে যেতে জঙ্গলের সেই জানোয়ারটা বেরিয়ে এল আবার। নির্জন উন্মুক্ত প্রান্তরে সেই নিভৃত প্রকৃতিচারীর মনে একটু খানি আনন্দের বার্তা রটে গেল। জঙ্গলের রাজ্যে সভ্য মানুষের আচরণ মোটেই আনন্দের নয়।

কার্টার ফিল্ড গ্লাস দিয়ে বাঁ পাশের পর্বত শিখরের দিকে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল।

গোগো ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। অনেক দূরে অস্পষ্ট স্যাভলটা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে মাইল পাঁচেক হবে। একটু ডাইনে ঘেঁষে খাঁজটার অবস্থান।

কার্টার হাসি মুখে বলল—তোমরা দেখতে পাচ্ছ? তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে চলো স্যাভলের দিকে। গোগো পারছে না আর এই দুর্ধর্ষ আমেরিকান সাহেবের সঙ্গে হীরের সন্ধানে এসে কি ঝক্‌মারি না

হয়েছে। গোগো জানে প্রত্যেক অভিযানেই একজন দলপতি থাকে। দলপতির আদেশই চুড়ান্ত। গোগোর সাহস নেই উপেক্ষা করবার।

পাঁচ দিন চলার পরে রিখটারসভেল্ড পর্বত শ্রেণীর কাছাকাছি গিয়ে পৌছল ওরা। গোগোর মনে হলো, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশি দুর্ভেদ্য ও ভয়ংকর। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে জলীয় বাষ্প পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যামেরুণ পর্বতে ধাক্কা খেয়ে রিখটারসভেল্ড পর্বতের সানুদেশে বৃষ্টি নিয়ে আসে। সে জন্য এখানে গাছপালা বেশী।

কার্টার বলে দিয়েছে ওদের দুজনকে, এ বনে খুব সন্তর্পনে চলাফেরা করতে। বন্দুক সব সময়ের জন্য রেডী রাখতে। জামার পকেটে কম্পাস রাখবে। একবার যে পথ দিয়ে যাবে ফেরার পথে-পথের চিহ্ন ধরে ফিরবে। পথ হারিয়ে কতো লোক এই জঙ্গলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

কিছুটা চলার পরে গোগোর মনে হলো তার শরীরটা কেমন করছে। কী ধরণের অস্বস্তি হচ্ছে সে কিছু বোঝাতে পারছেনা··· অথচ চলার শক্তি নেই। চোখ দুটো বুজে আসছে কেমন। দেখতে পাচ্ছে না কিছু। কি করে এমন হলো। চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্ষিদে আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে গেল না কি?

গোগো শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে পা বাড়াবার চেষ্টা করল। পারলো না। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কিন্তু উঠতে গিয়ে মনে হলো প্রকাণ্ড একটা ভারী শরীর টেনে তুলতে পারছে না সে। তারপর কি হলো গোগো কিছু জানে না।

কার্টার আর যীশু অনেক খুঁজে ওর অচেতন দেহটা মারিপোসার জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেলো, তখন রোদের রং ফিকে হয়ে এসেছে। প্রথমটা কার্টার ভাবলো, এ নিশ্চয়ই মাম্বার বিষাক্ত ফুৎকারে মারা গেছে। কিন্তু মুহূর্তকাল ধ্যানস্থ হায় হৃদপিণ্ডের

স্পন্দন শুনতে পেল। হঠাৎ কার্টারের চোখে পড়ল সেই বিষাক্ত গাছটা। যার ডাল পাতায় এক ধরনের বিষাক্ত সুগন্ধ থাকে কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে অচৈতন্য হতে পারে। এমন কি মৃত্যু হওয়াটাও আশ্চর্যের নয়।

তাঁবুতে এসে গোগো দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। সারাটা শরীর কেমন ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে গেল। কার্টার বলল ...আর কিছুক্ষণ ওখানে থাকলে তোমাকে বাঁচানো যেতো না।

ভেল্ড-এর এই জায়গাটাকে বলা হয় 'ডেথ সার্কেল' তোমার অবস্থা দেখে প্রথম সন্দেহ হয় যে, হয় তো আমরা ডেথ সার্কেলের মধ্যে এসে পড়েছি। সেটা বোঝার জন্যই আমাদের এতখানি মাশুল দিতে হলো।

যীশু বলল...আমাদের কম্পাস গেল কোথায়? কম্পাস থাকতে দিক ভুল হচ্ছে কেন?

কার্টার বলল...সময় খারাপ, কম্পাস ঠিক চলছে না। রিখটারসভেল্ড পর্বতের রেঞ্জের মধ্যে এসে প্রচণ্ড তাপে কম্পাসের ম্যাগনেট পাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে।

তা হলে উপায়?

উপায় নিশ্চয়ই আছে, হতাশ হলে চলবে না। লক্ষ্য স্থানে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। তুমি একজন অভিযাত্রী। সৃষ্টির সন্ধানে তুমি নিবেদিত। চলতে চলতে এক সময় মনে হবে পথ বুঝি ফুরোবে না আর! যন্ত্রণায় অবসন্ন শরীরটাকে ধরিত্রীর অভ্যান্তরে লুক্কায়িত হীরের খনি অপেক্ষা করছে তোমার আশায়, সে কথা ভুললে চলবে না।

গোগো বলল...অবস্থা খুবই খারাপ সায়েব, ম্যাপ ভুল, কম্পাস চলছে না, সময় এখানে অচল। মানুষ জনের সাড়া নেই, খাবার নেই, জল নেই, শুধু মাথার উপর এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্য .. তার মাঝে ভয়ংকর মরণ ঘূর্ণি নিপুণ ফাঁদ পেতে লুকিয়ে আছে।

…মৃত্যু শিয়রে জেগে ওৎ পেতে আছে আট প্রহর। দু-একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী এই অভিশপ্ত জঙ্গল পাহাড়ে হীরে খোঁজ করতে এসে ফিরে যেতে পারেনি। এখানে কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

কার্টার কিন্তু হেরে যাবার পাত্র নয়। মৃত্যুকে সে পরোয়া করে না। আরও তিন দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে! এ-সব জঙ্গলের কুল কিনারা নেই কিছু। আগে মাঝে মধ্যে ফাঁকা জায়গা একটুও বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে ঘুরতে অবশ হয়ে এসেছে। চির গোধূলির রাজ্য এখানে। প্রচণ্ড দুপুর বেলায়ও সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না।

কথা বলতে বলতে কার্টার দূরের যে পাহাড়ের চূড়োটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছিল, সে দিকে একবার চেয়ে দেখল। ঠিক মুহূর্তে মেঘের ঘোমটা সরিয়ে রিখটারসভেল্ডের চুড়োটা উঁকি দিল, যেন এক খামচি দিয়ে তুলে নিয়েছে।

কার্টার বলল…এখান থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে কেনিয়া কি নাইরোবী পাঁচশো থেকে ছশো মাইলের মধ্যে অফুরন্ত মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল দুশো মাইলের মধ্যে কিন্তু কেপ কলোনী এখান থেকে অনেক দূরে সুতরাং সে কথা চিন্তা করে এখন লাভ নেই বরং আরও কিছুটা এগিয়ে তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা করি, বলে একটু থেমে কার্টার আবার বললেন…তোমরা তো ভারতবাসী। যুগ যুগ ধরে তামাম দুনিয়ায় ভারতই হীরে যোগান দিয়েছে। কোহিনূর হীরে এখন প্রায় কিংবদন্তীর মতো কিন্তু এই হীরেটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ গোদাবরী তটে মসুলিপট্টমে পেয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন কোহিনূর পাওয়া গেছে অন্ধ্র প্রদেশে গোলকুণ্ডার কাছে কিলুর খনিতে ১৩০৪ সালে প্রথম অবস্থায় কোহিনূরের ওজন ছিল ৭৯৩ ক্যারাট। নাগপুরের কাছে ওয়েনগঙ্গানদীর পাড়ে যে হীরে পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত নিখুঁত।

হিমালয়ে লাল রঙের হীরে পাওয়া গেছে। সেই যে বিখ্যাত হীরে স্টার অফ ইষ্ট এটিও টাভেরনিয়ে ভারত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। গুজরাট শহরে এক যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রয়েছে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষের লাশ। সেনাপতি আর সৈনিক রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে শুয়ে আছে। মৃত সেনাপতির পোষাকে লাগা ধূলো থেকে হীরেটি পেলো জীবিত এক সৈনিক।

আঠেরো শতকের প্রথম দিকে দেখা গেল ভারতের ডায়মণ্ড রাশ ফুরিয়ে এসেছে। কারণ যুগ যুগ ধরে হীরে তোলার পর একদিন তাতে টান পড়বেই। পূবের এই ভাঙন শুরু হতেই পশ্চিমে নতুন করে গড়ে ওঠার খবর পাওয়া গেল। খবর এলো ব্রাজিলে অঢেল হীরে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের হীরের উৎস যেন নিজেকে গুটিয়ে মাথা তুলেছে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে ব্রাজিলে ১৭২৫ সালের কথা। ইউরোপের কিছু লোক হীরে সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। সেই উদ্দেশ্যে ব্রাজিলে পর্তুগীজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। কিছু দুঃসাহসী লোক স্বভাবতই এর পথিকৃৎ। রিও ডস মেরিনহসের কাছে নদীর বালি ছেঁকে সোনা বের করার কাজে ব্যস্ত ছিল কিছু লোক। সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর রাতে তাসের আড্ডা দিয়ে মনটাকে চাঙা করে রাখতো। তাসের হিসেব রাখার জন্য ছোট ছোট নুড়ি ব্যবহার করা হতো, একদিন সেই তাসের আসরে আচমকা হাজির হলো এক গোয়ানিজ ভদ্রলোক···সিবাস্টীনো প্রাভো। নুড়িগুলি হাতে নিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। সিবাস্টিনো বুঝলেন এইগুলি সাধারণ নুড়ি নয়···প্রত্যেকটিই দামী হীরে। তার কৌতুহলের উত্তরে আড্ডার লোকেরা জানালো এ ধরণের নুড়ি তারা আরও অনেক পেয়েছে। বেশি চক্‌চকে পাথর দু-তিনটে রেখে দিয়ে বাকিগুলো ফেলে দিয়েছে। আমস্টারডানের জহরতের বাজারে পরীক্ষা করে হীরে পাওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো। তেজুকোর কাছে পাওয়া সেই জায়গায় রাতারাতি এক হীরের খনি বেরিয়ে পড়ল। শুরু হলো

ডায়মণ্ড রাশ। ব্রাজিল থেকে অনেক বিখ্যাত হীরে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে স্টার অফ সাউথ, ইংলিশ ড্রেসডেন, রিজেন্ট ভারগস ও ব্রাগাঞ্জা উল্লেখযোগ্য!

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরে প্রাপ্তির সঙ্গে একটা ঘটনা জড়িয়ে আছে। অ্যান্টেনিও ডিস্যুজা, থোসে কলিজ এবং টমাস ডিস্যুজা নামে ব্রাজিলের তিন অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো। জেল নয়, ফাঁসি নয় ··শুধু জঙ্গলে নির্বাসন শহর বসতি বা সভ্য সমাজের ধারে কাছে এলেই বাকি জীবন জেলে কাটাতে হবে। বিচারের পর তিনজন জঙ্গলে ঢুকে গেল। আদিবাসী, জীবজন্তু ও ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করে ও তারা নতুন জীবনের আশা ছাড়েনি। অ্যাকেট নদীর প্রায় শুখনো খাতে তারা সোনা খোঁজার কাজে লেগে গেল। একদিন এই নদীর খাতেই তারা কুড়িয়ে পেল রাজহাঁসের ডিমের আকারে চক্‌চকে্ এক পাথর। তিনজনেই বুঝতে পারল অসাধারণ একটা হীরে তারা খুঁজে পেয়েছে। এত বড়ো হীরে দেখা তো দূরের কথা এর আগে শোনেনি কেউ। নানা মুনি এর ওজন নিয়ে নানা কথা বলেছেন। অধিকাংশের মতে এর ওজন ১৬০০ ক্যারাট। আসলে এটাই পৃথিবীর সব থেকে বড়ো হীরে।

হীরে পেয়ে সভ্য সমাজে ফেরার জন্য ব্যাকুল তিন সঙ্গীর মনে আশার আলো উঁকি দিল। হয়তো এই হীরের বিনিময়ে সভ্য সমাজে আবার ফেরা যাবে? কিন্তু শহরে গিয়ে নিজেদের অবস্থাটা যাচাই করতে সাহস হলোনা। গেলেই হয়তো জেলে পুরে দেবে এমন সময় অভয় দিলেন এক পাদ্রী। তিনি নিজের দায়িত্বে স্থানীয় গভর্ণরের কাছে এদের নিয়ে গেলেন। ভিলারিকার গভর্ণরের হাতে হীরেটি দিয়ে তিনজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হীরের জন্য কোন পুরস্কার চায়না। শুধু ক্ষমা ভিক্ষা চায়···সভ্য সমাজে ফিরে যেতে চায় আবার। গভর্ণর সেই পাথরটি পরীক্ষার জন্য পাঠালেন। আসলে সেটা যে একটা পালিশ না করা হীরে

তাতে সন্দেহ নেই। তিন সঙ্গীকে মার্জনা করা হলো। হীরেটি যেখানে পেয়েছিল সেখানে নতুন করে প্রসপেক্ট শুরু হলো। এই রকম গল্প কার্টার অনেক শুনেছে। যীশু কি একটা জিগ্যেস করতে যাবে, তখন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। কোথা দিয়ে কি একটা হয়ে গেল। অন্তত যীশুর তো তাই বলেই মনে হলো। সমস্ত পৃথিবীটা কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। এমন কেঁপে উঠলো যে, ওরা তিনজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, চোখের-সামনে অন্ধকার...দেখতে পেল না কিছু। কাছেই কোথায় যেন আকাশ কাঁপিয়ে হাজারটা বাজ পড়ল। মাটি যেন চিড়ে-ফুঁড়ে ফাঁক হয়ে গেল…গাছপালা উপড়ে পড়ল। কার্টার মাটি থেকে মুখ তুলে বলল, ভূমিকম্প। খুব সাবধান… উঠবার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু পরক্ষণেই চোখে পড়ল দূরের আকাশটা লাল হয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকার ফুঁড়ে বেশ কয়েক মাইল জুড়ে আলো জ্বলে উঠেছে।

যীশু অবাক হয়ে দেখল দূরের সেই পাহাড়টার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছে। লেলিহান আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত। আগুন রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠছে পাহাড়ের চূড়ো থেকে, হাজার হাজার ফুট উঁচুতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে শ্বাসরোধকারী উৎকট গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

কার্টার সে দিকে চেয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল —সর্বোনাশ! জীবন্ত আগ্নেয়গিরি! সাণ্টা আনা গ্রাৎসিয়া ভা কর্ভোভা। ওর লক্‌লকে লেলিহান জিভ দিয়ে সমগ্র অঞ্চলটাই গ্রাস করে রেখেছে। কি বিচিত্র ধরণের ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য। চোখ জুড়িয়ে গেল ওদের। কি ভীষণ সুন্দর দৃশ্য প্রকৃতি এখানে সাজিয়ে রেখেছে ওদের জন্য। মনে হলো কে যেন এক কোটি তুবড়ী এক সঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে। লক্ষটা রং মশাল এক সঙ্গে ধরিয়ে দিয়েছে কেউ! মহা প্রলয়ের আগুনের মোচ্ছবে দিগ-দিগন্ত রাঙা

হয়ে উঠেছে। সেই রাঙা আগুনের লকলকে শিখা মাঝে মাঝে হাজার হাজার ফুট উপরে উঠে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ করে জ্বলে ওঠে। তেমনি করে হাজার হাজার ফুট উপরে ঠেলে উঠছে। আর সেই সঙ্গে হাজার হাজার বোমা ফাটার আওয়াজ। সেই আওয়াজ হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

পায়ের নীচে পৃথিবী কাঁপছে চোখের সামনে পাহাড় ফাটছে। গোগো কোন রকমে টলতে টলতে উঠে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। ঢুকেই দেখল একটা ছোট কুকুর ছানার মতো জীব তাঁবুর এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আগুনের তাড়া খেয়ে এখানে এসে বাঁচার তাগিদে আশ্রয় নিয়েছে। জানোয়ারটা ভয়ে কাঁপছে। গোগো টর্চের আলো জ্বালতেই প্রাণীটা চমকে উঠে আলোর দিকে চেয়ে রইলো, আর তার চোখ দুটো মণির মতো জ্বলতে লাগল।

কার্টার তাঁবুতে ঢুকে দেখে বলল ছোট্ট ডিক্ ডিক্। তাড়িয়ে দিও না। আমাদের অতিথি হয়েই এসেছে।

ভয়ার্ত প্রাণীটার দিকে চেয়ে গোগো এই মুহূর্তে বুঝল বেঁচে থাকাটাই জীবের প্রধান ধর্ম আর সে জন্য চাই যে কোন একটা অবলম্বন।

ভূগোলে এই আগ্নেয়গিরিটার নাম কোনদিন শোনেনি। এ আগ্নেয়গিরি যে কি ভয়ঙ্কর তা ওদের জানা ছিলনা। কার্টার ম্যাপ খুলে মিলিয়ে দেখতে লাগল ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা তিনজনেই আঁৎকে উঠলো ভয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল একটা বিশাল ওজনের লাল টক্‌টকে পাথরের চাই ঝোপের উপর এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও ও দাউ দাউ করেও জ্বলে উঠল ওদেরই চোখের সামনে। কার্টার করে বলল, পালাও গোগো। পালাও। এখানে থাকলে বাঁচবে না আর। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড ভর্তি হয়ে গেছে। আর নয়। পালাও।

দৌড়···দৌড়··দৌড়। হাতের সামনে যে যা পেল ছুটলো তাই নিয়ে। আধঘন্টা পরে ওরা যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করেছে। আবার দৌড়। এই মুহূর্তে মৃত্যু ভয় ভুলে গিয়ে জঙ্গল পাহাড়ের বাধা ঠেলে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই দৌড়তে লাগল ওরা। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে দুজনে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

আর পারছি না গোগো। হয়তো উঠতে পারবো না আর। গোগো কোনো উত্তর দেবার আগেই, ঠিক সেই সময় দূরের জঙ্গল থেকে আর্তনাদের মতো ডাক শোনা গেল, 'গোগো—।' প্রথমটা গোগো ঠিক বুঝতে পারলো না, পরে আবার···অনেকটা দূর হলেও এবার চেনা গেল। কার্টারের গলা। গোগো তড়াক্ করে উঠে পড়ে বলল, কার্টারের গলা না? বিপদে পড়েছে মনে হচ্ছে। ফুল প্যান্টের নীচেটা অনেকটা গুটিয়ে নিল গোগো। যীশুর হাত থেকে হান্টিং টর্চখানা নিয়ে বলল, তুই এখানে থাক, আমি দেখে আসছি। যীশু বলল, বাঃ—আমি একা থাকবো নাকি? চল্ আমিও যাবো।

দুজনেই উঠে জঙ্গলের মধ্যে ছুটলো। গোগো প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল, কার্টার। কার্টার। কোনদিকে? কার্টারের আর কোন সাড়া নেই। যীশুর হাত ধরে আন্দাজে ছুটছে গোগো। একটু আগে ওদের শরীরটা যে ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছিল তা উধাও হয়ে গেছে কোথায়। গোগো বিপদের গন্ধ নিঃশ্বাস টেনে বুঝতে পারে। কার্টারের বিপদের কথা টের পেয়ে সে যীশুর দিকে মনোযোগ দিতে ভুলে গেছে। শক্ত ভাবে যীশুর হাত চেপে ধরেছে, ছুটতে যীশুর অসুবিধে হলেও জোরেই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে গোগো আর মাঝে মাঝে কার্টারেরর নাম ধরে চিৎকার করেছে।

একটু বাদেই মানুষের গলা পাওয়া গেল, গোগো যীশুর দিকে ঘুরে বলল, তুই শুনতে পাচ্ছিস—কার্টারের গলা?

হ্যাঁ

কোন দিকে?

গভীর জঙ্গলের দিকে অনেকটা ভেতরে।

দুজনেই তখনো ছুটছে। গোগোর হাতে চার ব্যাটারীর টর্চের আলো, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে জঙ্গল পাহাড়ের প্রতিটি কোণ। যীশু বলল, আমার একবার মনে হলো কি একটা জন্তু গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল, সিংহ কিংবা গরিলা টরিলা নয় তো?

খুঁজতে খুঁজতে ওরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পৌছালো। অনেক দূরে আগ্নেয়গিরির সেই ভাঙা চূড়োটা দেখা যাচ্ছে তখনও সেটা দিয়ে উত্তপ্ত ধোঁয়া ফুঁসে উঠছিল। কিছুদূর গিয়েই একটু খুঁজতেই গোগোর টর্চের আলো পড়লো একটা মানুষের শরীরে।

দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে কার্টার, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি ভিজে গেছে। জামা-প্যান্ট ছেঁড়া, চুলের মধ্যেও চাপ চাপ রক্ত। মাথার কাছে একটা ভেরোনিকা ফুলের গাছ—গাছটায় একটাও পাতা নেই, ফুলও ফোটেনি। যীশু আর গোগো এই গাছটা আগেও দেখেছিল, এখন সেই গাছটার নীচেই পড়ে আছে কার্টার। গোগোর টর্চের আলো স্থির হয়ে রইল। ভয়ে বিস্ময়ে যীশু শিউরে উঠলো। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে বলল, সায়েব—। না, না ··।

যীশু ভেঙে পড়ছিল, গোগো একটা হাত বাড়িয়ে তাকে আটকে বলল, করছিস কি। যীশু তবুও ছটপট করে চেঁচিয়ে উঠল, সায়েব···সায়েব···। গোগো এক পা করে এগুতে এগুতে বলল, মরে গেছে ·বুঝি মরেই গেছে কার্টার উঃ, এত রক্ত!

যীশু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কিছু হয়নি। মরতে পারে না, অসম্ভব, মানুষের মৃত্যু আমি দেখিনি, আজও দেখবো না। সায়েব বেঁচে আছে হয়তো। গোগো, তুই মুখে জল দে একটু—।

গোগো অনেকটা শক্ত হবার চেষ্টা করছে। জীবনে সে কখনো

এ ধরণের দৃশ্য দেখেনি। মুখখানা রক্তে মাখামাখি, প্রায় চেনা যাচ্ছে না। হাতের রাইফেলটা মাথার কাছে পড়েছিল। কব্জির উপরে বাঁধা কম্পাস যন্ত্রটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। গোগো তাড়াতাড়ি সেটাকে হাত থেকে খুলে দিল।

যীশু আরও এগিয়ে এসে ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল। কানের কাছে মুখ এনে আস্তে করে ডাকল··সায়েব। সায়েব।

সায়েবের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল, কি যেন বলতে চেষ্টা করছে। সে যীশুর দিকেই চেয়ে আছে অথচ তার চোখে দৃষ্টি প্রদীপ জ্বলছে না। কেমন যেন নিস্পৃহ উদাস দৃষ্টি, কার্টারের একটা হাত খুঁজে বের করে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলো যীশু।

সেই ভেরোনিকা ফুলগাছটার ফুল ছিলোনা, কাঁটা ছিল। একটা কাঁটা গোগোর গায়ে বিঁধতেই সে বিরক্ত দৃষ্টিতে গাছটার দিকে তাকালো। বেশ শক্ত জংলী ফুলের গাছ, ফুল নেই কিন্তু ফুলের অপেক্ষায় ধারালো কাঁটার পাহারা ঠিক আছে! গোগো হাত দিয়ে খুব সাবধানে ধরে সেই গাছটা হেলালো, আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই তার, গাছটাকে মাটিতে নুইয়ে তার উপর বুট জুতো পরা দুটি পায়ে সেটাকে চেপে ধরলো। তারপর বলল, যীশু, আমি মাথাটা তুলে ধরছি, তুই পায়ের দিকটা সাবধানে ধর, সায়েবকে এখুনি তাঁবুতে নিয়ে চল।

আট

পাথরের চাতালে কার্টারকে শুইয়ে দিয়ে মুখে জল দিল, তার পর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখল বাঁ-কাঁধের পাশে অনেকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সারা পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত। কোন এক অসাধারণ শক্তিশালী জন্তু ধারালো নখ দিয়ে পিঠখানা চিরে ফালা ফালা করে দিয়েছে।

পাশেই ঝোপের মধ্যে কয়েকটা ডাল পালা ভেঙে পড়ে আছে। পাতাগুলি দুমড়ে মুচড়ে নেতিয়ে আছে। হয়তো কোন এক ভীষণ জন্তু ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে ডালপালা গুলো। সায়েব বেঁচে উঠবে? যীশুর গলার আওয়াজে এমন একটা বিষণ্ণ ভয় ছিল যে গোগো সোজাসুজি তাকালো। আলতো ভাবে চোখদুটো মুছে নিয়ে বলল, যীশু, তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? সায়েবের কিচ্ছু হবে না। ওরা আমেরিকান, জীবনে ওরকম অনেক আঘাত পেয়েছে। এক বার তো মরতে মরতে বেঁচেই গেল সায়েব, নিশ্চয়ই মনে আছে তোর?

সারারাত দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেল, কার্টারের সাড়া পেল না, দুটি চোখ মেলে তাকালো না। সকাল বেলার দিকে একবার তার চেতনা ফিরে এলো। গোগোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। চেয়ে চেয়ে কি দেখলো। যেন এর আগে সে কোন দিন গোগোকে দেখেনি। চোখদুটো বন্ধ করে খুব আস্তে কি সব বকতে লাগল। পুরুত ঠাকুর যেমন চোখ বুঁজে মন্ত্র পড়ে, কার্টারও সেই রকম কি সব বলতে লাগল। গোগো এক অক্ষরও বুঝতে পারলো না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার চোখ মেলে তাকালো মনে হলো এবার গোগোকে চিনতে পেরেছে। শরীরের

সমস্ত শক্তি একত্র করে সে বলল…গোগো এখনো বসে আছো তোমরা? তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ো, আমাদের ডাকছে…শুনতে পাচ্ছ না? তারপর হাত দুখানা শূন্যে তুলে নির্দেশের ভঙ্গীতে বলল …অনেক গুপ্তধন লুকানো আছে ঐ পাহাড়ের তলায়। প্রকৃতি তার গোপন কক্ষে রাজ ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না? চলো যাই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে। পিছিয়ে গেলে চলবে না।

এটাই কার্টারের শেষ কথা।

পাথরের চাতালের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে গোগো আরাম করে বসেছিল। খুব ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে। অনেকদিন গোগো এই রকম সূর্যোদয় দেখেনি। বাতাস এখন বেশ ঠাণ্ডা, ভোরের আলো অনেকটা ছানার জলের মতো রঙ্। সূর্য তখন উঠি উঠি। শুধু জঙ্গলের মাথায় নীলচে আলো। সূর্য উঠলেও তাকে অনেকক্ষণ দেখা যাবে না। গোগো তবুও অপলকে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলো। সে জানে এই জঙ্গলের বিস্তার খুব একটা বেশী নয়, তবু রাত্রিবেলা মনে হয়েছিল সীমাহীন। ভোরের আলোয় এখন আবার সবকিছু স্বচ্ছ। সবকিছু সঠিক আয়তনে ফিরে আসছে।

তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে পাথর বিছানো রাস্তার সামনে ওরা থমকে দাঁড়ালো। এক জায়গায় কয়েক ফোঁটা রক্ত তখনো চাপ বেঁধে আছে। সেদিকে চোখ পড়তেই দুজনেই চমকে উঠলো। এই কদিনেই ওরা কার্টারকে সত্যিই ভালবেসে ছিল, তার নির্ভীকতা, কঠিন সংকল্প এবং পরিশ্রম করার মতো অসাধারণ শক্তি, তার স্নেহ এবং ভালবাসা ওদের দুজনকেই মুগ্ধ করেছিল। ওরা দুজনেই সেই বিজন বিঁভুয়ে কার্টারকে অত্যন্ত আপন জনের মতো মনে করতো কিন্তু এসবের চেয়ে গোগোর বেশি মনে হলো যে বুভুক্ষু আফ্রিকা কতো সাহসী অভিযাত্রীর বলি গ্রহণ করেছে।

রাস্তা চিনতে ওদের ভুল হলো না। মেঘ ভেঙ্গে রোদ উঠেছে। পাখিদের কিচির মিচির শুরু হয়েছে। দুজন আদিবাসী অনেক দূরে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে গেল। ওদের কুড়ুলের ফলায় রোদের ঝলসানি অনেকক্ষণ চোখে পড়ল। একটু দূরে যেতেই এক জোড়া বুট জুতো চোখে পড়ল—কার্টারের জুতো।

জুতো জোড়া সযত্নে তুলে নিল ওরা। তারপর ওরা সেই জায়গায় পৌছুলো—সেই গাছটার কাছে যেখানে অনেকখানি কালচে রক্ত, জামার ছেঁড়া একটা টুকরো আটকে আছে কাঁটায়। একটা কাঠবেড়ালী রক্তের ওপর সন্ত্রস্ত ভাবে গন্ধ শুঁকছিল—ওদের দেখে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। যীশু প্রথমে বলল, কাল আমরা এই কাঁটা গাছটার সামনেই কার্টারকে খুঁজে পেয়েছিলাম।

সূর্যের আলো ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য অনেকটা ফিকে হয়ে গেল। কিন্তু শব্দ ও পাথর পড়ার যেন বিরাম নেই। শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব সুক্ষ্ম ধূসর রঙের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে। গাছপালা লতা পাতার উপর দেখতে দেখতে ছাই ভস্মের আস্তরণ জমে গেল। সারাদিন সমান আয়তনে আগুনের তাণ্ডব চলল—আবার রাত হলো। পাহাড়ের নিচে উপত্যকা ভূমি হেমলক গাছের জঙ্গল আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত পাথরের বর্ষণে সম্পূর্ণ পুড়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের লীলা দেখা গেল তবে আগুনের উৎপাত কিছুটা কমেছে কিন্তু ধোঁয়া এবং মেঘের ঘটায় আকাশ ছেয়ে গেছে।

রাত তখন তিনি প্রহর। হঠাৎ একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের ঝিমুনি থেমে গেল। ওরা সভয়ে চেয়ে দেখল জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মাথার দিকটা উড়ে গেছে। কোথায় পড়েছে কে জানে? যীশুর পায়ের কাছে একটা পাথর পড়েছে খুব অল্পের

জন্য ঘায়েল হয়নি। ওদের তাঁবুর সামনে জঙ্গলটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

গোগো ভাবছিল—এই বিজন অরণ্য অঞ্চলে কি ভীষণ একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেল তা লোক চক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল ! সভ্য জগৎ জানেও না আফ্রিকার নিবীড় অরণ্যে এক দুঃসাহসী রত্ন সন্ধানীর জীবনাবসানের কাহিনী। হয়তো বললেও বিশ্বাস করবে না কেউ।

সকাল বেলা বেশ পরিষ্কার। মোমবাতি নিভে গেলে মাথার দিকটা যেমন অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে পাহাড়ের চূড়োটা ঠিক তেমন দেখাচ্ছে।

গোগো ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বলল...ওই আগ্নেয়গিরিটার উল্লেখ ম্যাপে নেই। হয়তো অতীতে শান্ত ছিল ওটা, বহু বছর পরে জেগে উঠেছে আবার। কিন্তু এর অগ্ন্যুৎপাতে মাইলের পর মাইল গাছপালা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওরা দুজনেই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সূর্য্যদেবের মন্ত্র উচ্চারণ করল—ওম্ জবা কুসুম সংকাশ্যং……ক্যাশপেয়ং মহাদ্যুতিম্………।

হে রুদ্র দেব তোমাকে প্রণাম। তোমার ভয়ঙ্কর সুন্দর মূর্তি দেখে হীরের খনি আবিষ্কারের নেশাও তুচ্ছ হয়ে যায়। তোমার ভীষণ সংহার মূর্তি দেখে আমাদের জীবন সার্থক হয়েছে। দুঃসাহসী ভবঘুরে রত্নানুসন্ধানী কার্টারের সমাধি হলো তোমারি পায়ের তলায়। টের পেল না কেউ। সিংহ, গরিলা, হায়না সেই সমাধির চারপাশে ঘোরা ঘুরি করবে আর সবার উপরে সবাইকে ছাপিয়ে নীরব দর্শকের মতো অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে থাকবে তুমি, এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

নয়

কার্টারের মৃত্যুর পর দুদিন কেটে গেল। গোগো এখন দুঃসাহসে মরীয়া হয়ে উঠেছে। যদি তাকে হীরের খনি খুঁজে বের করতেই হয় তা হলে ভয় পেলে চলবে না। যীশু একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো কার্টার এক সময় বলেছিল সলস্‌বেরি ......এখান থেকে পূর্ব দক্ষিণে পাঁচশো মাইলের উপরে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সলস্‌বেরী।

গোগো ম্যাপখানা খুলে ভালো করে দেখলো। কার্টার এই ম্যাপখানা তাকে দিয়েছে। ১৮৭৩ সালে রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরী উপকূলের ম্যাপ, বিখ্যাত পর্তুগীজ ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড অঞ্চলের ফরেষ্ট সার্ভে করেছিলেন পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট, তারই একখানা খসড়া যোগাড় করেছিলেন কার্টার। ছোট বেলা থেকেই ম্যাপ দেখতে ওস্তাদ ছিল যীশু। এখন তাকে ম্যাপ দেখে রোডেশিয়ার সেই ভয়ংকর অরণ্যের মধ্যে থেকে বেরুবার পথ খুঁজে বের করতে হবে।

কার্টারের সমাধির সামনে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মতো শ্রদ্ধা জানালো ওরা। দুটো কাঠি আড়াআড়ি ভাবে দিয়ে ক্রশ চিহ্ন তৈরী করে সমাধির পাশে রাখল!

'বুশ ক্রাফট' বলে একটা কথা আছে। সীমাহীন গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে চলার সময় জঙ্গলের চরিত্র সম্বন্ধে জানা না থাকলে বিপদ অনিবার্য। কার্টার বলে দিয়েছিল, দীর্ঘ এলিফ্যাণ্ট ঘাসের জঙ্গলে এলে বুঝতে হবে জঙ্গল ফুরিয়ে এসেছে। প্রথম দুদিন চলার পরে ওরা একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। ভোরবেলা তাঁবু গুটিয়ে ওরা রওনা হলো। এরোপ্লেনের পাইলটেরা যাকে বলেন

'ফ্লাইং ব্লাইণ্ড' সেই ভাবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা চলেছে, ভাগ্যে কি আছে বুঝতে পারছে না। দুদিন চলার পর অনেকটা দিকভ্রান্তের মতো জঙ্গলের জালে জড়িয়ে গিয়ে ঘুর পাক খাচ্ছে শুধু।

ঘণ্টা দুই এ ভাবে চলার পর যীশু বলল, ভয় পেলে চলবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে চলাফেরা না করলে এ বিপদ থেকে বাঁচার উপায় নেই, একবার যে পথ দিয়ে এসেছি গাছের গুঁড়ির গায়ে নিজের নামের আদ্যাক্ষর লিখে রাখলে পথ হারাবার ভয় থাকবে না। তোমার চারপাশে সব সময়েই গাছের জটলা, অগণিত অজস্র, তার হিসেব নিকেশ নেই। মাথার উপর চন্দ্রাতপের মতো ডাল-পালা লতা পাতা চাবড়া, বেঁধে আছে। দিনের আলো দেখা যায় না যেন চির গোধূলির রাজ্য। মাইলের পর মাইল ঐ একই ব্যাপার। কম্পাস এখানে অকেজো, সূর্য দেখে দিক ঠিক করবে সে উপায়ও নেই।

তিনদিন চলার পরে একটা পাহাড়ের কাছে এসে বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালো। খুব কাছেই প্রকাণ্ড একটা গুহার মুখ, একটা ক্ষীণতোয়া নদী গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গুহার মুখটা প্রকাণ্ড। যীশু অনেকটা কৌতুহলের তাড়া খেয়েই গুহার মধ্যে ঢুকলো। গোগো ওর পিছে। গুহার সামনেটায় যদিও একটু আলো—ভেতরটা মিশমিশে অন্ধকার, গোগো টর্চ জ্বেলে খুব সন্তর্পনে এগিয়ে গেল। প্রতি পদক্ষেপেই সর্তকতা। হঠাৎ চোখে পড়ল ডাইনে বাঁয়ে আরো দুটো মুখ। উপরের দিকে টর্চ জ্বেলে দেখল দু পাশে ব্যাসাল্টের দেওয়াল, কিন্তু ছাদটা শাদা শক্ত নুনের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পুরু স্তর দিয়ে তৈরী।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণ ধারায় নেমে আসছে। ভীষণ গুমোট গরম গুহার মধ্যে, তাছাড়া পান করার মতো জল নেই। গলাটা শুকিয়ে এসেছে।

পাথরের দেয়াল বেয়ে যে জল চুঁয়ে পড়ছে তা অপেয়। ক্ষারভর্তি। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম কোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শেষ হয়ে যায় না। দেওয়ালে ভিজে লোনা জল জিভ দিয়ে চেটে তৃষ্ণার সাধ মেটাবার চেষ্টা করলো গোগো। পারলো না। তৃষ্ণা আরও প্রবল হয়ে উঠল। গুহার বাইরে অন্ধকার নেমেছে। রাত্রি নেমেছে ধীরে। তখন ওরা পথ হাতড়াচ্ছে, টর্চের আলো এতো ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, গোগো ভয়ে উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। গোগোর শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আর পারছি না যীশু, এবার পড়ে যাবো, হয়তো এই গুহার অন্ধকারেই নিয়তি ওৎ পেতে আজ আমাদের জন্যে দিনের আলো কি ফুটবে না আর! কার্টারের বলি গ্রহণ করেও আফ্রিকার রক্ত তৃষ্ণা মেটেনি—গোগো অনেকটা পাগলের মতো কথাগুলি বলল।

সময় কতোটা হলো ওদের হিসেব নেই। একটা ইঁদুর কি আরশুলা নেই যে ধরে খাবে। এই মুহূর্তে ওদের কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রনাটাই ভয়ংকর। গোগোর অবস্থা দেখে যীশুর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে সব। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে এ গুহা থেকে যে করেই হোক গোগোকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। অনেক দিন সূর্য উঠতে ওরা দেখেনি। তাই ওরা মরীয়া হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই ভাবে হাতড়াবে।

যীশু আশ্চর্য, সেই নদীটাই বা গেল কোথায়? অন্ধকার গোলক ধাঁধায় ঘুরবার সময় নদীটাকে হারিয়ে ফেলেছে কোথায়। নদীটা দেখতে পেলে হয়তো বেরিয়ে আসার একটা পথ খুঁজে পেত। কারণ নদীর একমুখ গুহার ভিতরে থাকলে অন্য মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা একটু ভিজে বালির গন্ধ পর্যন্ত নেই।

জিভটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে। কথাটুকু বলার মতো শক্তি নেই গোগোর।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে গোগো খুঁজতে লাগল। ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথায়ও শ্যাওলা পাওয়া যায় যদি তবু খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু পাথরের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের স্তর জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে ঠোঁট দুটো ফুলে গেছে। একটা ব্যাঙের ছাতা কি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ও নেই। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে জন্মাতে পারে না।

সময় কত হলো ওদের হিসেব নেই। ঘড়ির কাঁটা এখানে চলছে না। একটু একটু করে হতাশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ওরা। এ ভাবে কতদিন চলবে আর। শরীর ভেঙ্গে গেছে। তবু বিরাম নেই চলার। সময়হীন, শব্দহীন, জনহীন, মৃত পৃথিবীতে অভিশপ্ত প্রহরীর মতো শুধু ওরা দুজনেই বেঁচে আছে।

আর কিছুক্ষণ এ ভাবে থাকলে ওরা পাগল হয়ে যাবে।

দশ

গোগো আর যীশু যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন বেলা শেষ। জোনাকির আলোয় চারি দিক আলোকিত হয়েছে। বনস্পতির মাথার উপরে আধখানা চাঁদ লট্‌কে আছে অনেকটা ময়লা ঘুড়ির মতো। প্রাণভরে ওরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিল, এই অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্য।

ভোর হলো। শান্ত রোদ উঠল। গোগো ভাবল আর নয়। এইখানে মুহূর্তকাল থাকবে না আর। পকেটে একটা পাথরের নুড়ি নিয়ে এসেছিল, অবহেলার সঙ্গে ফেলে না দিয়ে দুঃসময়ের স্মারক হিসেবে সেটা যত্নকরে নিজের কাছে রেখে দিল।

কিছুক্ষণ পরে এলিফ্যান্ট ঘাস চোখের সামনে উঁকি দিল। শুধু ঘাস নয়। ঘাসের জঙ্গল। রাতে গোগো ম্যাপ খুলে বসল। সামনে যে উন্মুক্ত প্রান্তর চোখে পড়ল এটা তিনশো মাইলেরও বেশী বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসী নদী পর্য্যন্ত। এই বিস্তীর্ণ এলাকার কিছুটা গ্রাস করে আছে কালাহারি মরুভূমি। কি ভীষণ বালুকাময় মরুভূমি! লোকজন নেই। গাছপালাও নেই। কার্টার বলেছিল, এই সব অঞ্চলের উত্তর পূর্ব কোণ ধরে না গিয়ে মাঝামাঝি যাওয়া মানেই মৃত্যুর ফাঁদে পা দেওয়া। মরুদানবের ছলনায় কতো লোক তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে মারা গেছে। রোডেশিয়া পৌঁছুতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

গোগো এখানে অনেক সাহসের পরিচয় দিল। মরুভূমি পার হবার কৌশল জানা ছিল না বলে যীশু কিছুটা দমে গেল। কিন্তু গোগো ওকে বোঝাল পঞ্চান্ন বছরের একজন আমেরিকান সায়েব এই দুঃসাধ্য কাজে সফল হতে পারে, তারা কেন পিছিয়ে যাবে ?

কিন্তু দুঃসাহস দৃঢ়তা এক জিনিস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। গোগো সাহসী হলেও ম্যাপ দেখে

গন্তব্য স্থানের দূরত্ব অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তার ছিল না। পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গলের যে ম্যাপ তৈরী করেছিলেন তার এক জায়গায় তুই মরু মধ্যস্থ কূপের জায়গায় ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিচিউড দেওয়া আছে। ম্যাগনেটিক নর্থ আর ট্রনর্থ জাতীয় কি একটা জটিল অঙ্ক কষে সঠিক জায়গাটার অবস্থান বের করতো কার্টার. গোগো দেখেছে কিন্তু এই মুহূর্তে সেই অঙ্কটা কষে বের করতে পারছে না সে।

দূর থেকে কালাহারি মরুভূমির চেহারা দেখে যীশু ভয়ে শিউরে উঠল। শুধু বালি আর বালি। যে দিকে তাকাও মনে হবে বালির সমুদ্র তুপুরের রোদে দাউ দাউ করে জ্বলছে! গোগো ছিল যীশুর পিছে সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে বাঁ দিকে একটা খেজুর গাছ দেখতে পেয়ে সে দিকেই ছুটলো। তার আশা ছিল জল না পাওয়া গেলে সেখানে ছায়াতো পাওয়া যাবে। তু দণ্ড জিরিয়ে নেবে ওরা।

খেজুর গাছের গোড়ায় এক খণ্ড ছায়া লুটিয়ে আছে। সেখানে পৌছে বিশ্রাম নিলো ওরা কিন্তু আশার অতীত আরও একটা জিনিষ চোখে পড়ল একটা মাঝারি গোছের খেজুর গাছের গোড়ায় একটা গর্তে খানিকটা জল। জল দেখে গোগো প্রথমে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই আশ্চর্য হয়ে ভাবল এই উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে—দিগ্বিদিক দাউ দাউ করে জ্বলছে যেখানে বিশেষ করে ঐ খেজুর গাছের গোড়ায় জল এলো কি করে? কোন ভৌতিক কাণ্ড নয় তো? গোগো চিৎকার করে যীশুকে ডাকতে লাগল। যীশুও ততক্ষণে সেই দিকে ছুটে এসেছে। গাছটার গোড়ায় পৌঁছে বড় বড় দম ছাড়তে ছাড়তে একটা ব্যাপার দেখে সেও অবাক! গাছের মাথা থেকে এক ফোঁটা স্বচ্ছ জল সেই গর্তের মধ্যে টপ্ করে পড়ল। ওরা তুজনেই উঁপরের দিকে তাকালো কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। হঠাৎ যীশু হো হো করে

হেসে উঠল বলল ঐ দ্যাখ গোগো, জল ঝরানো পোপর দল, গাছের ডালে কেমন চাকলা বেঁধে আছে। মরুভূমির কোন কোন অঞ্চলে এই ধরণের পোকা দেখা যায়।

পৃথিবীর বুক শূন্য-নয়, প্রভৃতি নিজের গোপন কক্ষে তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্য এই রকম ভাবে জল নিয়ে-অপেক্ষা করছে।

ওরা দুজনেই প্রায় এক সংগেই দেখল গাছের ডালে এক থোকা খেজুরের মতো গোবরে পোকার চেয়েও আকারে বড়ো কতকগুলো পোকা।

গোগো বিজ্ঞানের ছাত্র হঠাৎ মনে পড়ল ওর ওরা এক রাত্তিরে প্রায় দেড় সের জল ঝরায়, ওদের পেটের ভেতর নদী আছে, যীশু বলল—কি করে বুঝলি ?'

আমি বইয়ে পড়েছি। না হলে এত জল ওরা পায় কোথেকে ? এ জল দিন রাতই ঝরছে তবু ফুরোয় না। আসল ব্যাপারটা কিন্তু পোকাগুলি গাছের গুড়ি থেকে রস ও হাওয়া থেকে জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে জল ঝরায়।

গোগো আঁচলা ভরে জল পান করে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলল, ম্যাপে নির্দেশ আছে, উত্তর পূর্ব কোণ ধরে এই মরুভূমির পার হতে হবে। মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। কারণ সেখানে জল এক ফোটাও নেই। জল যে উত্তর পূর্ব দিকে আছে তাও ঠিক নয়, তবে পঞ্চাশ মাইল একশো মাইল ও দুশো মাইল ব্যবধানে পরপর কয়েকটা উনুই আছে যাতে জল পাওয়া যায়। পাহাড়ের ফাটলে অথবা গুহার কাছাকাছি সেগুলি দেখা যায় কিন্তু খুঁজে বের করা খুবই কঠিন, পর্তুগীজ গবরমেন্টের ফরেষ্ট ও হিল সার্ভের ম্যাপে এই সব জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্দেশ করা আছে।

কিছু দূরে চলার পর হঠাৎ চোখে পড়ল বেশ কিছুটা দূরে গোটা কয়েক উটপাখী চরে-বেড়াচ্ছে পাখী গুলোও তাদের দেখতে পেয়ে-

ছিল কিন্তু অন্যদিকে না পালিয়ে তারা ওদের দিকেই ছুটে আসতে লাগল। যীশু তো অবাক!

গোগোর কথা শেষ হতে না হতেই যীশু রাইফেল থেকে একটা পাখী লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট। উট পাখীর দল ধূলো উড়িয়ে তাদের সামনে দিয়ে সন্ত্রস্ত-ভাবে পালিয়ে গেল। যে পাখী ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী দৌড়য় তাকে গুলি করা কি সহজ? তবে যীশুর ভাগ্য ভাল। দ্বিতীয় গুলিটা অব্যর্থ লক্ষ্য। একটা পাখী পড়ে গেল।

মাটিতে পড়েও যন্ত্রনার্ত্ত শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু গোগো তীর বেগে ছুটে গিয়ে তার লম্বা গলাটা সজোরে চেপে ধরল।

উটপাখীর মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে কিছুটা খেয়ে বাকীটুকু ওরা সংগে নিল।

চলতে চলতে এক সময় ক্ষিদে তেষ্টায় গোগো উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে সে বুঝছে, এই ভীষণ মরুভূমি দুজনে মিলে পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সে এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখান থেকে ফিরে যাবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু গ্রানাইট পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে সে দেখল চারধারে শুধু বালির পাহাড।। পূর্ব দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমে ছোট্ট একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আকাশ সূর্যাস্তের রঙে লাল। মরুভূমির মধ্যে এ ধরণের ছোট পাহাড়ের নাম কোপয়ে। ট্রান্সভ্যাল ও রোডেশিয়ায় এ ধরণের কোপয়ে দেখতে পাওয়া যায় অনেক।

গ্রানাইটের ছোট একটা টিবির সামনে আসতেই একটা বোতল চোখে পড়ল, বোতল শুধু নয় একটা বেল্ট লাগানো চামড়ার ব্যাগ গোগো ভাবল, এখানে কি করে এলো চামড়ার ব্যাগ।

দু—পা এগুতেই সে চমকে উঠল।

ছোট-ঢিবিটার পেছনদিকে একটা কালচে নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডুটা চেনা যাচ্ছেনা। কঙ্কালের এদিক ওদিক ছেঁড়া জামার টুকরো ছেঁড়া টুপির কিছুটা অংশ। দুখানা ভারী বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে তখনো দেখা যাচ্ছে।

বোতলটায় কি আছে দেখার জন্য যেমনি যীশু সেটা তুলতে গেছে অমনি একটা খস খসে শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। নিমেষের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড সাপ বালিফুঁড়ে বেরিয়ে এলো বোধ হয় গিলে খাবার জন্য হ্যাঁ করেছে কিন্তু ঠিক সেই মূহূর্তেই যীশু এক হ্যাচকায় ছুরি-খানা তুলে ছুড়ে মেরেছে সজোরে। খুব অল্পের জন্যই সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে বেঁচে গেছে। এই প্রকাণ্ড হিংস্র বিষধর স্যাণ্ডো ভাইপারের চোখের মনির ভেতর ছুরির ডগাটা ঢুকে গেছে।

রক্তের ফোয়ারা নেমেছে চোখ থেকে। সে কিছুক্ষণ নিষ্ফল আক্রোশে লেজের প্রান্ত ভাগ মাটির উপর আছড়াতে আছড়াতে নিস্তেজ হয়ে গেল একসময়।

আশ্চর্য ভাবে রক্ষা পেল। বোতলটা তুলে নিয়ে সেটাতে বেশ কিছুটা তরল পদার্থ দেখতে পেল। লাল আলতার মতো রঙ-বটে, তবুও জল।

গোগো মনে ভাবল ঐ টুকুই পান করে দুজনে তেষ্টা মেটাবে। বোতলের ছিপি খুলে ডক ডক করে গোগো সেই আলতা গোলার মতো লাল জল খানিকটা পান করল তারপর সে সাপের মুখে টর্চের আলো ফেলে দেখল, পুরো দশহাত লম্বা সাপটা, বেশ মোটা। এ ধরণের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে লুকিয়ে শুধু মুণ্ডুটা বালির উপরে তুলে রাখে—মৃত সাপের চোখ দুটো তখনও বেদানার দানার জ্বলছে। মুখ খানা হিংস্রতায় ধক্ ধক্ করছে।

এইবার বোতলের-উপরের লেবেলটা মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো কিন্তু তার আগেই গোগো বলতে পারলো তার মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্ছে। হাত পা যেন অবশ হয়ে আসছে।

কথা বলার শক্তিটুকুও ফুরিয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। যীশু কাছেই ছিল। গোগো একটা চিৎকার করে বলল—পারছি না যীশু, জ্বলে গেল। বুকটা জ্বলে গেল।

যীশু নিরুপায়। গোগোর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে তাকিয়েছিল।

গোগো সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারছিল না। ওর সমস্ত শরীরটা পাকিয়ে দুমড়ে যাচ্ছিল। উন্মাদের মতো মাথা নাড়ছিল, আর খোলা বুকের উপরে জোরে জোরে হাত ঘষছিল। যীশু অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, গোগোর মাথাটা বুকের কাছে টেনে ধরে রেখেছিল আর তখনই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। গোগোর সেই ভয়ংকর মূর্তি। সমস্ত মুখখানা কালি মাখা। চোখের কোলে গভীর গর্ত, দৃষ্টি ভয়ার্ত কিন্তু স্তিমিত। ঠোঁট নীল, ঠোঁটের কোণে ফেনা জমছে।

যীশু চিৎকার করে বলল। কী করেছিস তুই? কি সর্বনাশ করেছিস?

গোগো কিছু বলতে পারছিল না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। শুধু আঙুল তুলে বোতলের দিকে নির্দেশ করল।

যীশু গোগোকে আরও জোরে চেপে ধরল। ওর চোখে তখন ভয়, আতঙ্ক, হতাশা একটু একটু করে জড়ো হয়েছে। অনেকটা বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অদূরে বোতলটার উপর দৃষ্টি থমকে গেল। যীশু দৌড়ে গিয়ে বোতলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে একটা ভয়ার্ত আশঙ্কায় ভ্রূ যুগল একত্র করে কি ভাবল। দিনের আলো নিভে এসেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়া দেখতে পেল।

সেই নির্জন জায়গায় ছায়াটা যেন যীশুর উদ্‌ভ্রান্ত মনে একজন সঙ্গীর মতো মনে হলো। ওর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল,

ওলোট পালট হয়ে গেল সব। নিজের ছায়ার সঙ্গেই ভুল বকতে লাগল। হঠাৎ।

হঠাৎ কিসের শব্দে সচেতন হলো। একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ ভেসে আসছে কোন দিক থেকে। কোন পরিচিত শব্দ নয়। শব্দটা কিসের? কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে যেন।

অনেক দূরে চোখ পড়তেই যীশু আনন্দ ও বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। অনেকগুলো উটের কাফেলা চোখে পড়ল। যীশু চিৎকার করলো, গায়ের জামা খুলে নাড়লো কিন্তু কিছুতেই কাফেলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। সামনে পেছনে ডানে বামে ধূসর মরুভূমি কাঁটা ঝোপ শূন্য, ধূ-ধূ জনশূন্য, মাঝে মাঝে অনুচ্চ বালিয়াড়ি, এর মাঝে সহিষ্ণু উটের নিঃশব্দ ছন্দময় গতি। একটু দূরেই পলক্রুগার পর্বতমালা। তার চারদিকে ঘন ঝোপ জঙ্গল, অসুস্থ গোগোকে নিয়ে কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। হয়তো হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেঁচে যেতে পারতো, কিন্তু কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? বন্দুকের আওয়াজটা হয়তো অনেক দূর যাবে কিন্তু এই দুর্গম পথে কেন মানুষ আসবে? হঠাৎ কি একটা প্রতিক্রিয়া হলো ওর মধ্যে বন্দুকটা লোড করাই ছিল ভাগ্যের উপর নির্ভর করে পরপর তিনটে গুলি শুন্যে ছুঁড়ল। কিন্তু আশ্চর্য্য বিপরীত দিক থেকে একটা বন্দুকের আওয়াজ করে কে যেন উত্তর দিল।

আনন্দ উত্তেজনায় যীশু গোগোর মাথাটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, এই গোগো একবার তাকিয়ে দ্যাখ, বলতে বলতে সে গোগোকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিল। লক্‌লকে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠল আকাশের দিকে। যীশু আবার বন্দুকের

আওয়াজ করল, তারপর চারিদিকে আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক জরীপ করবার দল, কিম্বার্লী থেকে কেপটাউন যাওয়ার পথে চিমানিমানি পর্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমি দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক থেকে পার হচ্চিল। সঙ্গে বত্রিশটা উট, তিনটে গাধা, নিগ্রো কুলি, দুজন বুশম্যান ও পাঁচ জন সার্ভেয়র। গোটা কয়েক হরিণ সংগে আছে। জঙ্গলের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে বন্দুকের আওয়াজ শুনে ওরা চমকে উঠল। কৌতূহল বেড়ে গেল ওদের। ইতস্তত খুজতে খুঁজেতে বনস্থলীর আগুন চোখে পড়ল। আগুনের ধোঁয়া অনুসরণ করে খুঁজতে খুঁজতে এক কঙ্কাল সার প্রেত মূর্তির মতো একটা মানুষের দিকে চোখ পড়ল। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে সে।

ওরা ছুটে গেল। যীশু কি বলল ওরা ভাল করে বুঝতে পারলো না। গোগোকে ধরে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

এগারো

যীশুর জ্ঞান ফিরে আসতেই প্রথমেই গোগোর খোঁজ করল। গোগোর মাথার কাছে উঠে এসে দাঁড়ালো। সারারাত রক্ত বমি হয়েছে। মুখ খানা ফ্যাকাশে—যেন শরীরের সমস্ত রক্ত কণিকা গুলি খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বিছানার পাশ দিয়ে একটা হাত করুণ ভাবে ঝুলছে। যীশু সেই হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল।

গোগো চোখ খুলে তাকালো। আবছা ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে চেনার চেষ্টা করলো। চোখের সামনে হিজি বিজি কি সব খেলে গেল। অস্ফুট ভাবে বলল, কে ? বাবলুদা ? না, আমি যীশু।

গোগো আবার ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু পরক্ষণেই যন্ত্রনায় কুঁকড়ে উঠে শরীরটা তুবার মোচড় দিয়ে কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল। একটা মাছি কোথায় ছিল খবর পেয়ে মুখের উপর বসল এসে।

যীশু স্তব্ধ। তার শরীরের স্নায়ু গুলি কাঁপছিল। তার বুকের মধ্যে আশ্চর্য এক অনুভূতি এসে হাড় পাঁজর গুলিতে মোচড় দিচ্ছিল, ময়লা শার্টের উপর দিয়ে গলার সরু লাইনটা দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে থাকা বুকের একটা অংশ। মাথার চুল হাওয়ায় অল্প অল্প তুলছে, যন্ত্রনাকাতর মুখখানা অফুরন্ত ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে। তখনও ঠোঁট দিয়ে কষ গড়াচ্ছিল গোগোর। কয়েকটা মাছি সেখানে মিটিং করছিল।

শ্মশানের স্তব্ধতা যীশু কোনদিন অনুভব করেনি। সে কোনদিন শ্মশানের যায় নি তবু তার মনে হচ্ছিল সে যেন শ্মশান থেকে ফিরে যাচ্ছে। সে একা! তার কোথাও কেউ নেই! সে আত্মীয় স্বজন হীন! গোগোর সঙ্গে কোনদিন আর দেখা হবে না! একটা ভুতুড়ে পথ দিয়ে হেঁটে তাকে কলকাতায় ফিরতে হবে!

———